ক্যাম্পাস লিটারেচার

অনলাইন সাহিত্য সাময়িকী

বর্ষ - ১
সংখ্যা - ৪
সেপ্টেম্বর-২০২০

চিরকুট
রাজনীতির প্রেক্ষাপট
বিষাদের কালবেলা
আহমদ ছফা
অশীতিপর

সম্পাদকের কথা:

বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চায় শিক্ষার্থীরা সূচনাপর্বের স্তম্ভ। আজকের সাহিত্যমনা শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতের সাহিত্যচর্চার প্রতিনিধিত্ব করবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ও তাদের সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করতে আমরা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনলাইন সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশনা এবং তাদের একটি প্লাটফর্মে আনার চেষ্টা করছি।

বর্তমান শিক্ষার্থীরা কি ভাবছে, তাদের দার্শনিক চিন্তার মূল প্রতিভূ কি, তাদের সামাজিক জিজ্ঞাসা কি ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি। ক্যাম্পাস লিটারেচার অনলাইন সাহিত্য সাময়িকীর সেপ্টেম্বর সংখ্যাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে করোনাকালীন অর্থনীতি, বর্তমান রাজনীতির হালচাল, শরৎচন্দ্র, আহমদ ছফা ও কর্ণেল তাহেরকে নিয়ে কিছু লেখা। চলচ্চিত্র ও বুক রিভিউ তো রয়েছেই। সাথে রয়েছে কিছু সরল গদ্যের গল্প ও সুনন্দ কবিতা।

উৎসর্গ

মৃণাল হক

অনলাইন সাহিত্য সাময়িকী

ক্যাম্পাস লিটারেচার

বর্ষ ১ । সংখ্যা ৪ । সেপ্টেম্বর ২০২০

স ম্পা দ ক

সাইফুল ইসলাম খান

ফয়সাল আহমেদ

নি র্বা হী স ম্পা দ ক

শ্যামেন্দু শ্যামাপ্রসাদ

ইমদাদুল আজাদ

স হ কা রী স ম্পা দ ক

সুহৃদ সাদিক

সাদিক মাহবুব ইসলাম

প্র চ্ছ দ

বাঁধন কুমার ঘোষ

ছ বি স্ব ত্ত্ব

ইন্টারনেট

যো গা যো গ অ থ বা লে খা পা ঠা নো র ঠি কা না

campus.lit.org@gmail.com

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

অর্থনীতিতে করোনার অভিঘাত/সাইফুল ইসলাম খান - ০৭
বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ/আল আমিন ইসলাম নাসিম - ১৫
বাঙালির ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র/তর্ণিকা হাজরা - ২১
বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসঃ আহমদ ছফা নির্দেশক লিটমাস টেস্ট/রমতুল্লাহ লিখন - ২৬
কর্নেল তাহের ও তৎকালীন রাজনীতি/প্রখর রুদ্র - ৩২

চলচ্চিত্র রিভিউ

গ্রামীণ প্রকৃতি ও জীবনের বিদ্রোহী রূপ/ইয়াসির আরাফাত - ৩৬
পদ্মা নদীর মাঝি/মিনহাজ আবেদীন জিদান - ৩৯

বুক রিভিউ

তোত্তোচান/নওরীন সুলতানা - ৪৪
পল্লীসমাজ/জান্নাতুল নওমী - ৪৭

গল্প

একটি চাঁদনীপসর রাত এবং অচিনপুরের কয়েকজন বাসিন্দা/শানিন হক - ৫১
একটা শাড়ির গল্প/রফিকুল নাজিম - ৫৫
শেষটা কেউ জানেনা/জাহিদ - ৫৮
শুক্রবার বিকেল বেলা/উম্মুল খায়ের হাফছা - ৬৩
প্রজন্মান্তর/ইজাজুল ইফাত - ৬৫

কবিতা

আমি নির্বাসনে যেতে চাই/নাঈম আরিয়ান - ৭২
আমার ষড়ঋতু/মোঃ সামিউল হক - ৭৩
প্রণয়ের অভিন্ন গঙ্গা/নয়ন চন্দ্র শীল - ৭৪
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে/অনির্বাণ দেবনাথ - ৭৫

সূচিপত্র

শেষ দেখা/তাসমী - ৭৬
আমি চাই তুমি ভালবাসো/মশিউর আলম অন্তু - ৭৭
অশীতিপর/তানজিমুল ইসলাম - ৭৮
স্বাধীনতার বীজপত্র/রেবেকা তাসমি - ৮০
প্রিয়তমা এসরাজ/হাফিজুর রহমান - ৮১
বিষাদের কালবেলা/রাতুল - ৮২
স্বপ্নভ্রম/আহমেদ সুমন - ৮৩
সভ্যতার কুলখানি/বিশাল সাহা - ৮৪
আলোর তাড়না/নাহিয়ান ফারুক - ৮৫
লাল বেলুন ও নবীন কিশোর/সাদিক মাহবুব ইসলাম - ৮৬
এবার শান্ত হও বিপ্লবী/মোহা: হাদিউল ইসলাম হাদি - ৮৭

প্রবন্ধ

অর্থনীতিতে করোনার অভিঘাত

-সাইফুল ইসলাম খান

১৭৯৮ সালে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস তাঁর অ্যান এসে অন দি প্রিন্সিপাল অব পপুলেশন (An Essay on the Principle of Population) বইতে জনসংখ্যা বিষয়ক একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হারে। এভাবে যখন খাদ্য ও জনসংখ্যার পরিমাণে অনেক বেশি ব্যবধান তৈরি হয়ে যায় তখন নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাঁর মতে এই সমস্যার সমাধান দুটি উপায়ে হতে পারে, তা হল- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক নিরোধ। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে- দেরিতে বিয়ে, বিবাহিত জীবনে সংযম, বহুবিবাহ পরিহার, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। প্রাকৃতিক নিরোধের মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত দারিদ্র্য, অপুষ্টি, নৈসর্গিক প্রতিকূলতা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি বিপর্যয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা সংহার হয়। ম্যালথাস মনে করতেন, প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা হলে প্রাকৃতিক নিরোধের মাধ্যমে এক সময়ে জনসংখ্যার বাড়তি অংশটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে জনসংখ্যা ও খাদ্যের জোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে বড় ধরনের কোন যুদ্ধ হয়নি। এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী একযোগে কোন মহামারীও আসেনি। ফলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। যদিও ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী খাদ্য সংকট ততটা অস্বাভাবিক হয়নি। তবুও তত্ত্বের আংশিক সত্যতা হিসেবে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিরোধ হিসেবে করোনা মহামারির বিস্তার দেখতে পাচ্ছি। এই মহামারিতে এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৫৭ লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং ৬ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে (২৫ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত)।

করোনাকালে সবচেয়ে তীব্র যে সংকট দেখা দিয়েছে সেটি হল অর্থনৈতিক সংকট। করোনা নিয়ে রাজনৈতিক দোষারোপও কম হয়নি, বিশেষ করে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। তবে সেই দোষারোপের আড়ালেও খেলা করেছে অর্থনীতি। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বেশ আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের টেক্কা দেওয়ার কথা বলে আসছে। সম্প্রতি (২০ জুলাই, ২০২০) বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামও তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৪ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশ হবে চীন। ফলে দেশ দুটির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ ২০১৯ সালের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, গত ১৪৯ বছর ধরে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশের অবস্থান দখল করে রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির অর্থনীতির আকার এখন ২১ দশমিক ৪৪ ট্রিলিয়ন ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবে তা আরেকটু বেশি, ২২ দশমিক ২০ ট্রিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ১৪ দশমিক ১৪ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি নিয়ে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিধর অর্থনীতির দেশ। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে ১৯৮৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চীনের গড় প্রবৃদ্ধি বেড়েছে অত্যন্ত উচ্চ হারে, ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। অল্প সময়ে বড় উন্নতির পথে এগিয়ে চলা চীনের সঙ্গে তাই স্বভাবতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই ২০১৮ সালে দেশ দুটি পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের মধ্যদিয়ে বাণিজ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারি বাণিজ্য যুদ্ধ শিথিল করতে উভয় দেশ একটি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও তাদের স্নায়ু যুদ্ধ এখনো কমেনি। এই প্রসঙ্গে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ জেফরি সাকস মনে করেন, আমেরিকা ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্বের জন্য করোনাভাইরাসের চেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হবে।

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে করোনাভাইরাস ছড়ানোর পর খুব দ্রুতই তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। করোনা যখন চীনে পাগলা ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল তখন বাতাসে একটি কথা ছড়াতে শুরু করল-"অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিতে চলা চীনকে থামাতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রচেষ্টা হতে পারে এটি।" কেননা প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু দেশে মহামারী ছড়ানোর অভিযোগ মানুষ বহুকাল আগে থেকেই শুনে আসছে। উহানে ছড়ানো করোনা ভাইরাসের পিছনে মার্কিন ষড়যন্ত্র খুঁজতে খুঁজতে যখন খোদ ইউরোপ-মার্কিন মুলুকেও করোনা ছোবল দিতে শুরু করল, অন্যদিকে চীনে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করল; তখন চীনকেই আসল কালপিট বলতে শুরু করল

সমালোচকেরা। যুক্তি হিসেবে সেই প্রথম যুক্তিটিই থাকল "অর্থনৈতিক নেতৃত্ব নিতে চীন এই ভাইরাস ছড়িয়েছে!" আর বিশেষ করে ভারতে ও আমেরিকায় রোগী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনকে দোষী করার প্রবণতাও বাড়তে থাকে। কিন্তু তার জন্য কোন পক্ষই নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারেনি।

তবে চীনকেও এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে দেখা গিয়েছে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছিল। ইউরোপে মার্শাল ডকট্রিন চালু করে তখন ইউএসএ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে সাহায্য করে নিজেদের মোড়লগিরি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই রূপে বর্তমানে চীন করোনার সময়ে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও বিক্রি করে নিজেদের দাদাগিরি দেখাতে শুরু করেছে। তাই ভাইরাসটি রাজনৈতিক হোক কিংবা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত হোক তার উপর ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দাবা খেলা চলছেই।

০২.

বিশ্বের ১৯০টি দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়ায় গোটা বিশ্বেই অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে। একদিকে লকডাউনের কারণে কারখানা বন্ধ থাকায় থেমে ছিল উৎপাদন। অন্যদিকে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম পড়ে গেছে, শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে, পর্যটন খাত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, হোটেল ও রেস্টুরেস্ট খাতেও নেমেছে বিপর্যয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র তথ্য মতে, 'করোনা মহামারিতে বিশ্বের অন্তত ৪০ কোটি মানুষ চাকরি হারিয়েছে।' ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও কমে গিয়েছে। ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্য খুলে দেওয়া হলেও এখনো অর্থনীতি পুরোদমে চালু হয়নি। করোনায় লকডাউনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্যে চরম ধস নেমেছে। এতে করে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি ২০০৯ সালের পর সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে।

অন্যদিকে করোনার কারণে বড় ধাক্কা খেয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনীতির দেশ চীনও। ডিসেম্বরের শেষ দিকে দেশটিতে প্রথম করোনার সংক্রমণ শুরুর পর হুবেইসহ বিভিন্ন প্রদেশে কড়া লকডাউন আরোপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানাসহ বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ কারণে জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছয় দশমিক আট শতাংশ কমে গিয়েছিল, যা ১৯৬০-এর দশকের পর সর্বনিম্ন। তবে গত ১৫ জুলাই, ২০২০ প্রকাশিত চীনের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশটির জিডিপি এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে আবার প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে। এই তিন মাসে চীনের অর্থনীতি তিন দশমিক দুই শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে, বছরের প্রথম ছয় মাসে গত বছরের তুলনায় অর্থনীতি ১ দশমিক ৬ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে।

০৩.

করোনার ছোবলে যখন বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশগুলো পর্যদুস্ত তখন বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অবস্থা কতটা করুণ তা সহজেই অনুমেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশে শিল্প বলতে ছিল নারায়ণগঞ্জের আদমজিসহ কিছু পাটকল, কাঁচা চামড়া আর চা। ফলে কৃষি নির্ভরশীলতাই ছিল এখানকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে গত চার দশকে তৈরি পোশাকসহ

বেশ কিছু খাতে সাফল্য দেখিয়ে কৃষি নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে শিল্প নির্ভরতার দিকে জোরে সোরেই আগাচ্ছিল বাংলাদেশ। পুরো দেশটাকেই আধা-শহরের মত ঢেলে সাজানোর যাত্রাও শুরু হয়েছিল। সেই যাত্রায় পাহাড়সম বাঁধা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাস।

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ায় শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরছে। কিন্তু কৃষি প্রধান গ্রামেও এখন সংকট দেখা দিয়েছে। কৃষি উৎপাদন ভাল হলেও ৬৬ দিনের লকডাউনের ফলে উৎপাদিত ফসল সময় মত বিপণন করা যায়নি। আর এরই মধ্যে বর্ষা চলে আসায় মাঠ-ঘাট এখন পানির নিচে। ফলে গ্রামেও এখন কাজ নেই। তার উপর সেখানে যুক্ত হয়েছে শহর ফেরত কাজ হারানো মানুষজন। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক বিনায়ক সেন তার এক গবেষণায় দাবি করেছেন, এপ্রিল-জুন মাসে সব কিছু প্রায় বন্ধ থাকায় শহরের শ্রমজীবীদের ৮০% আয় কমেছে, আর গ্রামের শ্রমিকদের আয় ১০% কমেছে। এই তিন মাসের ব্যবধানে সার্বিক দারিদ্র্য হার ২০ শতাংশ থেকে এক লাফে ২৯ শতাংশ হয়ে গেছে। নতুন করে ১ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ গরিব হয়েছেন এবং পুরোনো গরিবদের কষ্ট তিন গুণ বেড়ে গেছে।

বিপুল সংখ্যক মানুষের আয় কমে যাওয়ায় কিংবা শূন্যের কোঠায় পৌঁছানোয় এখন সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছেন তারা। ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষক বঞ্চিত হওয়ায় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজ হারানোয় তাদের ক্রয় ক্ষমতাও কমে গেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি জানিয়েছে, "মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সরকার ঘোষিত ৬৬ দিনের লকডাউনে ৩ কোটি ৬০ লাখ (প্রায় পৌনে ৪ কোটি) মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এ সময়ে ৫ কোটি ৯৫ লাখ মানুষের শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। আর নতুন করে ২ কোটি ৫৫ লাখ মানুষ হতদরিদ্র হয়েছেন।"

গ্রামে জীবন-যাপন ব্যয় কম হওয়ায় কাজ হারানো কিংবা আয় কমে যাওয়া মানুষ এখন গ্রামে ফিরে যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বলা হয়ে থাকে, গ্রামীণ অর্থনীতি প্রাধান উৎস মূলত তিনটি। তা হচ্ছে-০১. শহর থেকে পাঠানো টাকা, ০২. কৃষি ও ০৩. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স।

ক. শহর থেকে পাঠানো টাকা: পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রমজীবীদের আয় ৮০ শতাংশ কমে গেছে। শহরে বেসরকারি খাতে এখন মহামন্দা যাচ্ছে। বিভিন্ন খাতে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। কাজ হারিয়ে শহর থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গ্রামে ফিরে যাওয়ায় শহর থেকে গ্রামে টাকা পাঠানোর পরিমাণ কমে গেছে। লক ডাউন খোলার পরেও শহরের অর্থনীতি স্বাভাবিক হয়নি। বর্ষাকালের বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার ফলেও শহরের ফুটপাত থেকে বহুতল বিপণী দোকানে ক্রেতাশূন্য সময় পার করছেন বিক্রেতারা। বিক্রি কমে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

খ. কৃষি: দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০ দশমিক ৬২ শতাংশ কৃষি, বনজ ও মৎস্য খাতে নিয়োজিত। এবার ফসল উৎপাদন ভালো হলেও লকডাউনের কারণে মানুষের চলাচল ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা

ভেঙে পড়ায় সবচেয়ে ক্ষতিতে পড়েছেন কৃষক। উৎপাদিত ফসল শহরে এনে বিক্রির সুযোগ কমে যাওয়ার ফলে কৃষি ও কৃষকের করুণ দশা দেখা দিয়েছে। ৬ জুলাই প্রকাশিত ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'করোনায় বোরো কৃষকের লাভ ৪০ শতাংশ কমে গেছে। করোনা কারণে শ্রমিক সংকট, পণ্য পরিবহন ও আর্থিক টানাপোড়েনের মতো সমস্যারও মুখোমুখি হয়েছে কৃষক।' করোনার কারণে তিন মাস ধরে অর্থনৈতিকভাবে বিপদে থাকা মানুষের কাছে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে এসেছে বন্যা। একসঙ্গে দেশের ২১ জেলায় শুরু হওয়া বন্যায় এসব এলাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে মৎস খাতও। পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পোলট্রি ও ডেইরি শিল্প এক ভয়াবহ দুঃসময় পার করছে। এ সবখাতে জড়িত শ্রমিক থেকে শুরু করে উদ্যোগতা পর্যন্ত সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ফলে কমে গেছে আয়।

গ. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স: জাতিসংঘের 'ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিপোর্ট-১৯' অনুসারে, 'প্রবাসে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বিচারে ষষ্ঠ স্থানে বাংলাদেশের অবস্থান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৭৮ লাখ বাংলাদেশী প্রবাস জীবন কাটাচ্ছে।' সারাবিশ্বে বসবাসকারী ৭৮ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশীর সিংহভাগই অবস্থান করছে মধ্যপ্রাচ্যে। এখানে প্রায় ২৮ লাখ বাংলাদেশী বসবাস করে। করোনার কারণে গাল্ফ উপসাগরীয় দেশ বাহরাইন, কুয়েত, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতিতেও ব্যাপক ধস নেমেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতে, এ বছর এই দেশগুলোর অর্থনীতি ৭.৬ শতাংশ হারে সংকুচিত হবে। যার প্রভাব পড়ছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়েও। আবার কয়েক লাখ প্রবাসী কাজ হারিয়ে দেশে গ্রামের বাড়িতে চলে এসেছেন। ফলে এসব প্রবাসীর উপার্জন বন্ধ হয়ে গেছে। যা গ্রামের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে।

০৪.

বিদ্যমান সংকট মোকাবেলায় সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। গত পাঁচই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি কাটাতে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে শিল্প ঋণের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের ২০ হাজার কোটি টাকা, রফতানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষ ও কৃষকের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা, রফতানি উন্নয়ন ফান্ড ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, প্রিশিপমেন্ট ঋণ পাঁচ হাজার কোটি টাকা, গরিব মানুষের নগদ সহায়তা ৭৬১ কোটি টাকা, অতিরিক্ত ৫০ লাখ পরিবারকে দশ টাকা কেজিতে চাল দেয়ার জন্য ৮৭৫ কোটি টাকা। এছাড়াও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকও ৩ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছে। আর এবারের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তায় যে ৯৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার বড় একটি অংশ গ্রামে ব্যয় করা

হবে। এছাড়া সরকারের নিয়মিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাইরে ২ লাখ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রন্ধে রন্ধে ঘাপটি মেরে থাকা দুর্নীতি সে সব কর্মসূচিকে সফল হতে দিচ্ছে না। কোভিড-১৯ ভাইরাসের মতো করেই দুর্নীতি বাংলাদেশের গলার কাঁটা হিসেবে দেখা দিয়েছে। গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে সরকার ৫০ লাখ পরিবারকে নগদ সহায়তা দেয়ার একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যাতে পরিকল্পনা ছিল- প্রতিটি পরিবারকে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে তিন দফায় মোট সাড়ে ৭ হাজার টাকা দেয়া হবে। এতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম হওয়ায় এই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।

০৫.

আমাদের চিন্তায় থাকতে হবে, অর্থনীতিতে করোনার এই অভিঘাতের ফলে সামাজিক অপরাধ বাড়তে পারে। কাজ হারানো মানুষেরা জড়িয়ে পড়তে পারে অপরাধমূলক কাজে। তাই মানুষ যেন দ্রুত বৈধভাবে উপার্জন করার সুযোগ পায় সে দিকে নজর দিতে হবে। ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টে ২০২০' বা সহজে ব্যবসা করার সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এখানে ততটা সহজে ব্যবসা করা যায় না। সরকারকে এখন নজর দিতে হবে এই সহজে ব্যবসা করার সূচকের দিকে। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের কর্মসংস্থান খুঁজে নিতে পারবে। বিশ্বব্যাংক যে ১০টি সূচকের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে তা হল- ব্যবসা শুরু, নির্মাণ অনুমোদন, বিদ্যুৎপ্রাপ্তি, সম্পত্তি নিবন্ধন, ঋণপ্রাপ্তি, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর স্বার্থরক্ষা, কর পরিশোধ, সীমান্ত বাণিজ্য, চুক্তি কার্যকর ও দেউলিয়াত্ব মীমাংসা। তাই এসব বিষকে সহজলভ্য করতে হবে। নতুন উদ্যোক্তারা ব্যবসা করতে গিয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও হয়রানির মুখোমুখি যেন না হন সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এ ছাড়াও স্থানীয় নেতা, পুলিশ ও প্রশাসনের চাঁদাবাজী ও ঘুষ ঠেকাতেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

লকডাউন তুলে দেবার পর বিশ্ব অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু হয়ে যাওয়া ক্ষতি রাতারাতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তবে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা নিলে সামনে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। করোনার নেতিবাচক দিকের বিপরীতে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। সেটি হল বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে বহুগুনে। অনলাইন ব্যবসা ও যোগাযোগে পূর্বে যারা অভ্যস্থ ছিল না তারাও এখন এদিকে পরিচিত হয়েছে পরিস্থিতির কারণে।

এক তথ্য মতে, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এখন অনলাইনে বিক্রি বেড়েছে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। এ খাতে প্রায় ১ হাজার ২০০ প্রতিষ্ঠানে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আবার চার লাখ নারী উদ্যোক্তা ফেসবুকে পণ্য বিক্রিতে সক্রিয়। অনলাইনে দ্বিগুণ হারে ব্যবসা সম্প্রসারণ হচ্ছে। জার্মান ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টার সর্বশেষ তথ্যমতে, "বাংলাদেশে ই-কমার্সের বাজার দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। যা চলতি বছর ২ হাজার ৭৭ মিলিয়ন ও ২০২৩ সালে ৩ হাজার

৭৭ মিলিয়ন ডলার ছাড়াবে।” অনলাইনে শিক্ষা, ক্রয়-বিক্রয়সহ সব ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে করোনা কেটে গেলেও তা চর্চিত হবে বলে মনে হচ্ছে। ফলে আগামীর অর্থনীতি প্রযুক্তি ও অনলাইন নির্ভর হবে বলে যে পূর্বাভাস ছিল সে পথেই এই করোনাকালে বাংলাদেশ বহুগুণ এগিয়ে গেছে।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যসূত্র:

- করোনা ভাইরাস: আর্থিক প্রণোদনা কী? কারা, কেন, কীভাবে পাবেন এই প্রণোদনা?- (বিবিসি বাংলা, ১৭ জুন, ২০২০)
- বিশ্ব অর্থনীতির যে ক্ষতি করেছে ও করবে করোনাভাইরাস: এক নজরে- (কালের কণ্ঠ, অনলাইন, ৪ জুলাই, ২০২০)
- China could overtake the US as the world’s largest economy by 2024 - (weforum, 20 July, 2020)
- বাণিজ্য যুদ্ধ প্রশমনে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের চুক্তি- (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ১৬ জানুয়ারি ২০২০)
- প্রবাসীদের করোনাকাল ও আমাদের করণীয়- (জিয়াউর রহমান মুকুল, উখিয়া নিউজ, ০২মে, ২০২০)
- বিশ্বে প্রবাসীর সংখ্যায় ষষ্ঠ বাংলাদেশ, শীর্ষে ভারত-(চ্যানেল আই অনলাইন, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)
- করোনার ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ালো চীনের অর্থনীতি- (ইত্তেফাক, অনলাইন, ১৬ জুলাই, ২০২০)
- ‘যুক্তরাষ্ট্র-চীন স্নায়ুযুদ্ধ করোনার চেয়েও উদ্বেগের’- (প্রথম আলো, অনলাইন, ২২ জুন ২০২০)
- ৬৬ দিনে দেশে কাজ হারিয়েছেন পৌনে ৪ কোটি মানুষ- (জাগো নিউজ, ০৮ জুন ২০২০)
- করোনায় বোরো কৃষকের লাভ কমেছে ৪০ শতাংশ- (বাংলা ট্রিবিউন, ০৭ জুলাই, ২০২০)

- আট ধাপ এগোনো যথেষ্ট নয়: সহজে ব্যবসা সূচক- (প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০১৯)
- ৬৬ দিনের লকডাউনে গরিব হয়েছে ৬ কোটি মানুষ- (বাংলা ট্রিবিউন, জুন ০৮, ২০২০)
- অর্থনীতিতে চীনের ভেলকি- (ডিডাব্লিউ, ১৬ জুলাই, ২০২০ https://p.dw.com/p/3fOks)
- করোনায় জমজমাট ই-কমার্স- (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ জুলাই, ২০২০, শেষ পৃষ্ঠা)
- দারিদ্র্যবিমোচনের সাফল্য বেসামাল- (প্রথম আলো, ২৩ জুলাই, ২০২০, পৃষ্ঠা ৫)
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ৫ অর্থনীতির দেশ- (প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০)
- আগস্ট পর্যন্ত বন্যা স্থায়ী হবে- (প্রথম আলো, ২৩ জুলাই ২০২০, পৃষ্ঠা- ০১)
- বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি- (দৈনিক যুগান্তর, ১৩ জুলাই ২০২০,পৃষ্ঠা- ০১)
- করোনাভাইরাস- (https://bn.wikipedia.org/wiki/করোনাভাইরাস)

বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

আল আমিন ইসলাম নাসিম

রাজনীতি হল কোন সমাজের জন্য মূল্যবান বিষয়গুলোর কর্তৃত্বপূর্ণ সুষম বন্টন। অপরদিকে রাজনীতি হল অর্থনীতির সবচেয়ে ঘণীভূত বহিঃপ্রকাশ । সুতরাং বোঝাই যায়, অর্থনীতি ও রাজনীতি একে অপরের সম্পূরক। সুদীর্ঘ সময় ধরে দেখা গিয়েছে অর্থনীতি রাজনীতিকে শাসন করছে আবার রাজনীতিও অর্থনীতিকে শাসন বা নিয়ন্ত্রাধীন করে রেখেছে। কেননা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় উপকরণ, বস্ত্র, খাদ্য, চিকিৎসায়, শিক্ষা প্রায় সর্বত্রই অর্থ নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে। আবার এই নীতিনির্ধারক হিসেবে রাজনীতিই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু নীতিনির্ধারকই যখন ভক্ষক ও রক্ষক হিসেবে কাজ করে তখনই যেন যত্রতত্র অব্যবস্থনা ও দুর্নীতির অভিষেক ঘটে। দেখা যায় নীতিনির্ধারক নিজেই অঢেল সম্পদের আত্নসাৎ ও পাহাড় গড়তে ব্যস্ত।

বর্তমান কোভিড-১৯ এর সময়ে নীতিনির্ধারকদের সম্পদের পাহাড় গড়ার তেমনই চিত্র যেন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণে দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার ফলশ্রুতিতে লাখো মানুষ

কর্মহীন হচ্ছে, মিল-কারখানা বন্ধ, গার্মেন্টস্ প্রতিষ্ঠান বন্ধ, দ্রুত পচনশীল পণ্য সরবরাহ বন্ধ, স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত ব্যয়, কর্মহীনদের বেতন প্রদানের মতো ইত্যাদি কারনে ধ্বস নেমেছে অর্থনীতিতে। কাজেই অর্থনৈতিক এ ধ্বসের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনও ব্যাপক নড়চড়ে হয়ে গিয়েছে। শুধু দেশীয় রাজনীতির অঙ্গনে নয় বরং বৈশ্বিকভাবেও রাজনীতির অঙ্গনে ব্যাপক ভাঙ্গন ধরেছে। আর এই ভাঙ্গনের ফলেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ কেমন হবে তা রাজনীতি মনন ব্যক্তিদের নিকট চরম ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে !

অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকান্ডে অতি মনোনিবেশের ফলে রাজনীতি অঙ্গনের দিকে পর্যবেক্ষণ করতে যেন অনেকেই ভুলেই গিয়েছেন। অর্থনৈতিক দূরবস্থার ফলে রাজনীতির অঙ্গন আজ এতো উত্তেজিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত। বাংলাদেশের রাজনীতির এখন যেন মাৎস্যন্যায় অবস্থা। নানা ধোঁয়াশায় জর্জরিত। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্যখাত , রিজেন্ট সাহেদ ও ডাঃ সাবরিনা, বাঁধের অব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে বাঁক স্বাধীনতা হরণ, নাম মাত্র গণতন্ত্র, ক্যাম্পাসে ভাইতন্ত্রবাদ, গ্রামে ওস্তাদতন্ত্রবাদ রাজনীতি, সকল রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, তরুণদের রাজনীতি প্রাঙ্গণে নিরপেক্ষতা, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের তৈরি না হওয়া, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, ইত্যাদি যেন তার জ্যান্ত উদাহরণ ।

স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দের আশা করেছিল, বাস্তবে তা অনেকাংশে কম বলছেন বিশেষজ্ঞরা। মোট বাজেটে শতকরা হিসেবে স্বাস্থ্য খাত বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ৫ দশমিক ২ (৫.২%) ভাগ । অপরদিকে তার চেয়েও বেশি বরাদ্দ আছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসনে, সুদ পরিশোধ, স্থানীয় সরকার, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ যেমন কম, আবার বরাদ্দের যতটা না চিকিৎসার পেছনে খরচ হয়, তার চেয়ে বেশি খরচ হয় ভৌত অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও বেতন-ভাতার পেছনে। চলতি বছরের মোট বরাদ্দ ২৫ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকার মধ্যে ১৩ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা চলে গেছে পরিচালন খাতে। এর মাত্র এক চতুর্থাংশের মতো বরাদ্দ হচ্ছে ঔষুধ ও সরঞ্জাম কেনার পেছনে। বাকি অর্থ চলে যাচ্ছে বেতন-ভাতায়, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এখনো চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা অনেক কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী, একটি দেশে প্রতি একজন চিকিৎসকের বিপরীতে তিনজন নার্স ও পাঁচজন টেকনোলজিস্ট থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে তা নেই। এছাড়া বর্তমানে জেকেজির ডাঃ সাবরিনা ও রিজেন্টের সাহেদ এর চিকিৎসা সেবায় যে দুর্নীতি সে বিষয়ে সবাই জ্ঞাত ।

এমন ঘটনা আমাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পত্র-পত্রিকায় কিংবা সরাসরি টেলিভিশনে এমন প্রত্যক্ষ খবর লোমহর্ষক এর ন্যায়। এছাড়া রিজেন্টের সাহেদের কথা শোনা যায় সে নাকি রাজনৈতিক দলের উপকমিটির সদস্যও। এসব লোক রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততায় জড়িয়ে নানা অপকর্ম চালিয়ে কোটি কোটি হাতিয়ে নিয়েছে এই করোনার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। যেখানে রয়েছে কোটি মানুষের জীবনের প্রশ্ন, একই সাথে দেশেরও। এছাড়া সরকারের স্বাস্থ্যখাত ব্যতীত

যদি অন্য প্রসঙ্গে যাই যেমন: নদী বাঁধ প্রায়স্থানে আছে কিংবা নেই কিন্তু মজবুত বাঁধের ব্যবস্থা নেই, আর যারা নদী খননের কাজ করেছে, স্বয়ং আল্লাই জানে তারা কি করেছে? এইতো কিছুদিন আগে দেখলাম পত্রিকার ফন্ট পেজে একটা বাঁধ এলাকার তরুণ ছেলে বুকে লিখে রেখেছে (ত্রাণ চাই না, মজবুত বাঁধ চাই)। সত্যিই এগুলো মনকে হালকা করে রাখার মতো ঘটনা নয় ।

এছাড়া সরকারের 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের' অধীন একজন বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্রসহ অনেক জনকে বহিষ্কার কিংবা জেল জরিমানার মতো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটা স্ট্যাটাসের কারণে। মানুষ এখন সমালোচনা করতেও যেন ভয় পাই। বুয়েটের ছাত্র আবরার হত্যাকে কেন্দ্র করে এখন অনেক পিতা মাতাই তাদের সন্তানকে বলে থাকেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু না লিখতে, যদি কিছু হয়ে যায়। বাঁক স্বাধীনতা যেন হরণ করা হয়েছে, যা অগণতান্ত্রিক ।

গনতন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি? "গণতন্ত্র হল জনগণের দ্বারা গঠিত, জনগণের জন্য এবং জনগণের সরকার" কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ সংজ্ঞা পুরোপুরিই উল্টো। এখনও যেন গনতন্ত্রের চোরাবালিতে দেশের মানুষ নিমজ্জিত, যেখানে একজন সরকারের বিরূদ্ধে কথা বলতেই ভয় পাই। বর্তমান এই পরিস্থিতি থেকে কবে আমরা উত্তরিত হতে পারবো তা এখন গোলক ধাঁধার ন্যায়। তবে সরকার বা বিরোধী যে দলেরই হোক না কেন সকলের মনে রাখা উচিত "সমালোচনা গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।"

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দল দুটি: বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। কিন্তু যখনই যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন সর্বক্ষণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতেই যেন ব্যস্ত, সর্বক্ষণ অস্থিরতা। শুধু বর্তমান সরকার নয়, বরং বিরোধী বা বিগত দলগুলো যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতাই ছিলেন,

জনগণের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতেই বেশি নির্মগ্ন ছিলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে তখনও যেমন অস্থিরতা দেখা দিতো, এখনও যেন পরিস্থিতি অনেকাংশে তেমনই দেখা দেয়। যার ফল বর্তমান তরুণদের রাজনীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ মনোভাব ।

এছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছেলে-মেয়ে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হলেই যেন পিতা-মাতার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। রাজনীতির এ বেহাল দশা হবে কেন? যেখানে আমরা '৫২, '৭১ এর কথা শুনি ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র রাজনীতি ছিল বড়ো একটা অংশ, দেশকে স্বাধীন করার সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব তাদের ছিল। এখনও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি পৃষ্ঠপোষকতা সঙ্গে নিয়ে খুন, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, টেন্ডার বাজি, ইভটিজিং ইত্যাদির মতো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। তাহলে বুঝতেই পারছেন রাজনীতির কোন প্রাঙ্গনে আমরা অবস্থান করছি !

নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের দলটি বেছে নিয়ে থাকেন, কিন্তু গত দুই এক নির্বাচনে বর্তমান বড় বিরোধী দলের নাকচ দেখা যায়। এদিকে বর্তমান সরকারের কিছু নেতার কথা শোনা যায়, বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে না করুক, আবার বিএনপির ও কিছু নেতার কথা শোনা যায় ইসি সম্পর্কে বা আওয়ামী লীগ সরকার সম্পর্কে। কিন্তু এখানে বিএনপি অংশগ্রহণ না করলেও যেমন ক্ষতি, তেমনি আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করলেও তেমন ক্ষতি। কেননা বার বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ বর্তমান সরকার দলের মান সত্যিই ক্ষুন্ন করে ।

দেশের বড় দুটি দলের যেন বেজি আর সর্পের ন্যায় সম্পর্ক। সর্বদাই জনকল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের মহান প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। বর্তমান রাজনীতি প্রেক্ষাপটে যেরকম রাজনীতি দেখা দেয় তা হলো ভাইতন্ত্রবাদ। এই ভাইতন্ত্রবাদ রাজনীতির ফলেই প্রাণ হারাতে হচ্ছে অনেক সাধারণ মানুষ সহ অনেক তরুণদের। এই ভাইতন্ত্রবাদ রাজনীতির মুক্তি না ঘটাতে পারলে সাধারণ মানুষেরা সবসময় আতঙ্কেই থাকবে। এছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার অপব্যবহার যেন প্রায়ই দেখা যায়, ছোট বড়ো অনেক গ্রাম্য রাজনৈতিক দল যেন এটি আরও বেশি করে থাকে। ক্ষমতার জোর পূর্বক অপব্যবহার সব সরকারের সময়ই কম বেশি দেখা গিয়েছে । তবে পূর্বে ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আরেকটি বিষয়ের দেখা মেলে তাহলো ওস্তাদতন্ত্র। ওস্তাদ রাজনীতি করছে, রাজনীতির অপব্যবহার করে খারাপ কাজ করছে, কিন্তু কর্মী তার পক্ষে সাঁই দিচ্ছে । মানে বিষয়টি হলো এমন, "ওস্তাদ ইজ অলওয়েজ রাইট" রাজনীতি ।

সর্বোপরি দুর্নীতি, ভাইতন্ত্রবাদ, ওস্তাতন্ত্রবাদ রাজনীতি দূরীকরণে রাজনীতির অঙ্গনে ভবিষ্যতে রয়েছে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ। তা হলো নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা ও সকল দলের অংশগ্রহণ। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে। যেখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে সেখানে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ অনেকটাই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এতে প্রচারনায় বাঁধা বা

হয়রানির শিকার হতে হয় না, স্বচ্ছতা থাকে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে। তাছাড়া সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে, রাজনীতির পরিবেশও সুন্দর হয়ে ওঠে ।

প্রতিবারের ন্যায় স্বল্প সংখ্যক ভোটে নির্বাচন হওয়া, ভোটারের ভোট না দিতে পারা এসকল বিষয় সত্যিই রাজনীতিকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এ থেকে বিরত থাকতে হবে। সাধারণ জনগণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যেখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা থাকবে, মানুষ স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করতে পারবে। রাজনীতি সম্পর্কে আর কেউ হেন মন্তব্য করবে না। তরুণ মেধাবী ছাত্ররা দেশের উন্নয়ন সাধনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজে রাজনীতি অঙ্গনে আসবে। এছাড়া ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সবসময় এক দল অন্য দলকে দোষারোপ না করে, করোনার মতো এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমন্বয় আনতে হবে রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে এবং সেই সাথে সকল দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ জনসাধারণের জন্য একত্রে কাজ করতে হবে ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে সবসময়ই রাজনীতির মাঠ অস্থির হয়ে থাকে, যার ফলে বৈদেশিকদের সঙ্গে বানিজ্যিক সম্পর্কও গড়ে তালা প্রায়শই কষ্টকর হয়ে যায়। যা বাংলাদেশের জনগণের নিকট একান্তই কাম্য নয়। কেননা বাংলাদেশের মানুষ চাই, স্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনীতি পরিবেশ। যার মাধ্যমে দেশ ও দশ এগিয়ে যাবে, উন্নয়ন সাধিত হবে। পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য রাজনীতির পরিবেশ সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। যেখানে তাদের মেধা, শ্রম দিয়ে রাজনীতির অঙ্গন সমৃদ্ধ করবে। রাজনীতি বিকাশের বা রাজনীতি সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধি হয়ে থাকে। এছাড়া রাজনীতির ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে অন্যতম একটা চ্যালেঞ্জ হলো 'ছাড়'। সবসময় হানাহানি, গুম, কাটাকাটি, মারামারি রাজনীতি থেকে বিরত থেকে ছাড়ের মাধ্যেমে রাজনীতি করাই শ্রেয়। এর ফলে রাজনীতির ভাবমূর্তি রক্ষা পায় এবং সুশীল সমাজসহ সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ।

ভবিষ্যতে রাজনীতির ভাবমূর্তি রক্ষার্থে রয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ। তন্মধ্যে জনকল্যাণ সাধন, মানবিকতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকা। রাজনীতি সবসময় জোর পূর্বক ঘটনা ঘটাবে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে এমনটি নয়। দলবল নির্বিশেষে সকলের পরিকল্পনা হবে, "জনকল্যাণ সাধন করা, জনগণের কথা চিন্তা করা, ক্ষমতায় মগ্ন না হয়ে জনগণের সুযোগ সুবিধা গুলো নিশ্চিত করা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা"। এমন রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে সকলের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, পাশাপাশি ক্ষমতাবান রাজনীতি দলের উচিত হবে তাঁদের কর্মকান্ডের পূর্নাঙ্গ স্বচ্ছতা প্রদান ও জবাবদিহিতা করা। তবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। পরিশেষে রাজনীতি দলের মধ্যে সমঝোতা করে কাজ করতে হবে। নাহলে রাজনীতিতে প্রবেশ করে যাবে রিজেন্ট সাহেদের মতো লোকেরা। এছাড়া ভবিষ্যতে অনেক বাঁধা বিপত্তি আসতে পারে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন বা দুর্যোগ। এসকল কর্মকান্ডে সকল রাজনীতি দলের সরাসরি

অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে এবং সমন্বিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বর্তমান কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সকলের নির্বিশেষে কাজ করতে হবে।

প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে, জনগণের প্রতি মানবিক হতে হবে, একত্রে তাদের ত্রাণ সাহায্য করতে হবে। এছাড়া রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো দুর্নীতি। সুতরাং রাজনীতির মাঠে যে দলই আসুক, সকলের রাজনীতি আর্দশের একটাই মূলমন্ত্র হওয়া উচিত তাহলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করা। কেননা দুর্নীতি একটি দেশ ও জাতির উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। রাজনীতি দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করে থাকে । সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতির যে করুণ প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ তা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো রাজনীতির সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা এবং তরুণদের রাজনীতি প্রাঙ্গণে উজ্জীবিত করা। বাংলাদেশের মানুষ এমন হাহাকারের রাজনীতি চাই না, তারা চাই '৭১ এর সমঝোতার রাজনীতি, সুন্দর রাজনীতি, গনতন্ত্রের রাজনীতি, সর্বদলীয় নির্বাচনের রাজনীতি, তরুণদের প্রত্যাশার রাজনীতি যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকবে জনকল্যাণ সাধন! তবেই হয়তো দেশের যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে ।

যাইহোক সর্বশেষ একটা কাল্পনিক দৃশ্যের কথা শেয়ার করতে চাই, যেটি সর্বদা আমার মস্তিষ্কে ঘুরপাক করে। ট্রাম্পের দেশের একজন লোক, তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একটি প্লাকার্ডে লিখে হোয়াইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর এদিকে ট্রাম্প যাওয়ার পথে একটা মুচকি হাসি দিয়ে, লোকটিকে ‘গুড লাক’ বলে চলে যায়। আর এ দেশে...

শিক্ষার্থী: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

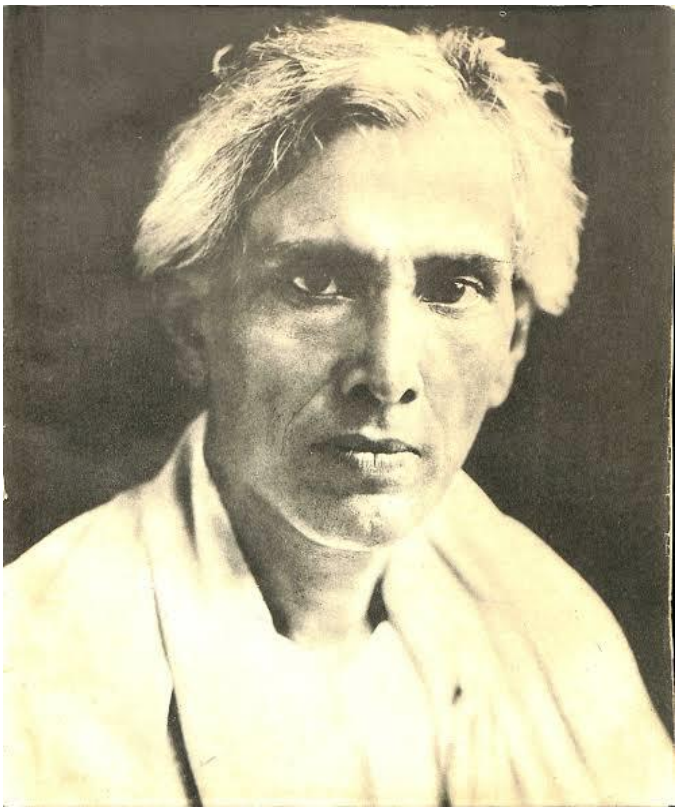

"তিনি আজীবন গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করেছেন।"

বাঙালির ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র

তর্ণিকা হাজরা

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সম্পূর্ণরূপে আধুনিক কালের সৃষ্ট সাহিত্য শাখা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিপুল সাহিত্য সম্ভাব সৃষ্টি হলেও উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়। ইংরেজদের আসার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও শিল্পের প্রভাব বিস্তার লাভ করে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলার কথা সাহিত্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফসল হলো বাংলা উপন্যাস। কালগত হিসেবে ১৮৫২ সালে প্রথম বাংলা উপন্যাস রচিত হয় একজন খ্রিস্টান বিদেশিনী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেস (১৮২৬-৬১) এর হাতে। উপন্যাসটির নাম 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) যা উপন্যাসের শর্তানুযায়ী সফল উপন্যাস ছিল না। এরপর ক্রমে ক্রমে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এর হাতে রচিত হয় যথাক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫২), 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) এবং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) যেগুলো সফল বাংলা উপন্যাসের সকল গুণ ধারণ করতে পারেনি।

১৮৬৫ সালে প্রথম সার্থক উপন্যাসের মর্যাদা পায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী'। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাস সার্থকতার পথে পদার্পণ করে এবং সেই পথে জন্ম নেয় একাধিক ঔপন্যাসিক। কালক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা নিয়ে পদার্পণ করেন উপন্যাসের জগতে। এর ফলে বিস্ময়কর বিবর্তন ঘটে বাংলা উপন্যাসের ধারায়। এ কালপর্বে বেশ কয়েকজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় সাহিত্যের জগতে যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)।

বাংলা সাহিত্যে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতের হুগলি জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক।[১] শরৎচন্দ্র তার অগ্রজ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি আপন প্রতিভার আলোয় স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর সাহিত্য ভুবনে। তিনি অসংখ্য উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক রচনা করলেও ঔপন্যাসিক হিসেবেই তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি আকস্মিকভাবে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দির'(১৯০৫) নিয়ে সাহিত্যের আসরে পদার্পণ করেন যা 'কুন্তলীন' গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'বড়দিদি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উপন্যাসটি ছদ্মনামে রচিত হওয়ায় অনেকেই সেটা রবীন্দ্র রচিত উপন্যাস বলে ধারনা করলেন। পরবর্তীতে মুগ্ধ পাঠকরা জানতে পারলেন এই বিচিত্র সুন্দর-অসাধারণ বাঙালি কাহিনি শরৎচন্দ্রের হাতে রচিত। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক শ্রী অসিতকুমার বন্ধ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন,
"... মুগ্ধ পাঠক মনে করিলেন রবীন্দ্রনাথই নাম গোপন করিয়া লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবুল জবাব দিলেন ইহা তাহার রচনা নহে। কিন্তু গল্পটা যে একজন অসাধারণ লেখকের রচনা, তাহা তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীও বুঝিল। পরে ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল, শরৎচন্দ্র মেঘমুক্ত সাহিত্যাকাশে সূর্যের পাশেই স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতে লাগিলেন।"[২]

শরৎচন্দ্র তাঁর মাত্র ২৮-৩০ বছর সাহিত্যের চর্চার কালপর্বে প্রায় তিরিশখানি উপন্যাস ও গল্প সংকলন, কয়েকটি নাটক ও বিখ্যাত চিন্তনমূলক কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতো ব্যাপক ও সফল রচনাসম্ভার তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ও মানসিক শক্তির পরিচয় বহন করে।
শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠার অন্যতম প্রধান কারণ তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনাতে বিশুদ্ধ বাঙালি জীবনকেই অঙ্কিত করেছেন নিষ্ঠার সাথে। তাঁর প্রতিটি ধারার সাথে দেশজ ও কালজ ছাপ স্পষ্ট যেখানে আষ্টেপৃষ্ঠে ছড়িয়ে আছে বাঙালির প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার ও জীবানুভবের বিষয়গুলো। তিনি বাঙালির সীমিত গন্ডির বাঁধা জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। ফলে তাঁর অনুভবের উৎস সুতীব্র এবং সুগভীর। একজন বিখ্যাত

সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের তুলনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেন যা থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের পরিসর যে বাঙালি জীবন কেন্দ্রিক তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।
"রবীন্দ্র কাব্যভাবনায় সহজ আবেগের ব্যপ্তি ঘটেছে বিশ্বচারণের অনন্ত নভোলোকে; রবীন্দ্র রচনায় অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যেও অতল গভীরতা লাভ সম্ভব হয়েছে কবির ধ্যান-মনীষাদীপ্ত বিশ্বচৈতন্যের প্রভাবে। শরৎচন্দ্রের জীবনাবেগে গভীরতা আছে, কিন্তু বাঙালি জীবনের সীমিত গন্ডির বাইরে তার ব্যাপ্তি নেই।" [৩]
শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বড়দিদি (১৯১৩), বিরাজবৌ (১৯১৪), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), পরিণীতা (১৯১৪), পন্ডিতমশাই (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), পল্লীসমাজ (১৮১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত-প্রথম পর্ব (১৯১৭), নিস্কৃতি (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), কাশীনাথ (১৯১৭)। [৪]
এ উপন্যাসগুলোর অধিকাংশই রচিত বাঙালি জীবন ও সমাজের পটভূমিতে। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ-আনন্দ-বেদনার সার্থক প্রকাশ আছে এখানে। তাঁর সৃষ্ট বেশিরভাগ উল্লেখযোগ্য চরিত্রই বাঙালির ঘরে ঘরে বিরাজমান। শরৎচন্দ্র পারিবারিক জীবনের যথার্থ রূপকার। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস দেবদাস (১৯১৭), বিরাজবৌ (১৯১৪), বড়দিদি (১৯১৩), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০) সহ অনেক উপন্যাসে বাঙালি পরিবারের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। পরিবারভিত্তিক এসব উপন্যাসে বাঙালি প্রেমের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মানবমনের প্রেমের বিচিত্রমাত্রিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে সফলতা পেয়েছে এসব উপন্যাস। প্রেমের সাথে সাথে মানবিক স্নেহ-মায়া-মমতা-দয়ার ব্যাপক বিস্তার তাঁর উপন্যাস জুড়ে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রেরণার মূলে আছে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশাল জগত। তিনি আজীবন গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করেছেন। এসব কারণে তাঁর সাহিত্যের জগত সাধারণ মানুষের পদচারণায় মুখোরিত। অসংখ্য অসহায়, দারিদ্র্যে পীড়িত মানুষের দুঃখ জর্জর জীবন তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জগত পূর্ণ করেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর নিজ সাহিত্য জীবন ও উপন্যাসের উপাদান প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন,
"... কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি...গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশে, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্ব-চোখে দেখা।" [৫]
শরৎচন্দ্র অন্তরের নিবিড় আকর্ষণে, হৃদয়ের টানে দিনের পর দিন ছুটে গিয়েছেন বিপর্যস্ত-পীড়িত জনমানুষের কছে, তাদের সহায় হয়েছেন। তিনি জানতেন যে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বাস্তবানুগ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বারেবারে ঘর ছেড়েছেন, ছুটেছেন বিভিন্ন স্থানে স্থানে। তাঁর গ্রন্থ 'শ্রীকান্ত'র শুরুতেই শুরু করেছেন নিজেকে 'ভবঘুরে' বলে বিশেষায়িত করে। "আমার এই

'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।"

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আলোচ্য সমস্যা বলে অধিকাংশক্ষেত্রেই বাঙালির সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, প্রচলিত বিশ্বাস, নৈতিকতার বোধকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। বাংলার গ্রাম্য সমাজের সমাজকর্তাদের নানা বঞ্চনা, অত্যাচার, শোষণকে তিনি নিঃসংকোচে-দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। তিনি তাঁর সাহিত্যে জমিদার, মহাজনদের অত্যাচার এবং ব্রাহ্মণদের বর্ণকৌলীণ্যের অহংকারকে ধূলিস্যাৎ করতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কখনো কলম ধরেছেন প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কখনো বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে, কখনো সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। মূলত শরৎচন্দ্র সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবেই সমগ্ররূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাঁর সাহিত্য অবশ্য আগাগোড়াই গ্রামীন মানুষের জীবনকে প্রস্ফুটিত করেছে। সমালোচকরা বা তাঁর জীবনীকাররা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা থেকে সহজেই উপলব্ধি হয়, গ্রামবাংলাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যের প্রাণ। তিনি নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন। [৬]

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পে বিবাহকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন নরনারীর মিলনের ক্ষেত্রে। তাঁর পাঠকপ্রিয় 'স্বামী', দেবদাস, 'পরিণীতা', 'শেষের পরিচয়' প্রভৃতি নানা উপন্যাসে তিনি বিবাহঘটিত সম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাসের সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণ করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাস 'গৃহদাহ' তে বিবাহের মাধ্যমেই মৃণালের কামনা বাসনার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তিনি বিবাহিত 'পার্বতী'র অন্যকোনো মুক্তির পথ দেখাতে পারেননি, বৈধব্যের সংস্কার থেকে বের করে আনতে পারেননি 'রমা' বা 'সাবিত্রী' কে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচকের উক্তি স্মরণযোগ্য,
"নরনারীর বিবাহকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন নি। এই বিবাহে যদি ব্যক্তিগত কামনা বাসনার চরিতার্থতা নাও মেলে তবুও মনের মধ্যে তাকে গুরুতর মূল্য দিতে তিনি সংকুচিত হন নি।" [১]
শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বাঙালি নারীর জীবনকে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচনাতেই প্রথম গ্রামবাংলার নারীর হৃদয়ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে অত্যন্ত যত্নের সাথে। 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'নিস্কৃতি'র শৈলজা-সরলা, 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুবাসিনী, 'পন্ডিতমশাই' এর কুসুম, 'পথের দাবী'র ভারতী প্রভৃতি সহ বেশ কয়েকটি উপন্যাসে বাঙালি মায়া-মমতাময়ী ও স্নেহময়ী নারীর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসের জ্ঞানদা, দেনা-পাওনার ষোড়শী প্রভৃতি চরিত্রে তিনি কিশোরী নারীদের তৎকালীন করুণ অবস্থাকে বর্ণিত করেছেন সযত্নে। 'দেবদাসে'র 'পার্বতী', 'বড়দিদি'র মাধবী, 'স্বামী'র সৌদামিনী প্রভৃতি হৃদয়পটে মুদ্রিত থাকার মতো অসংখ্য প্রেমময়ী নারীর চিত্রেও তাঁর উপন্যাস সমৃদ্ধ। মূলত বাঙালি নারীর প্রেমময়ী, সেবাময়ী, ভাগ্যবতী, স্নেহময়ী, পতিতা সহ বহুমাত্রিক রূপকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসের পাতায়।

কোনো কোনো সমালোচকের বক্তব্যে পাওয়া যায় শরৎ উপন্যাস সাহিত্যে তত্ত্বকথার অভাব। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি তত্ত্বের কথা তাঁর উপন্যাসের ব্যাখ্যা করে তত্ত্ব হিসেবে না বুঝিয়ে, তা কাহিনির ভিতরে গল্প সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর পাঠকসমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের রস গ্রহন করতে করতেই পাঠকের মানসিকতায়-চিন্তায় নতুন ভাবনার সৃষ্টি হতে থাকে সমাজ ও জীবন সম্পর্কে। তাঁর এই রস পরিবেশনের ক্ষমতা তাঁকে অনন্য ঔপন্যাসিকের মর্যাদা প্রদান করেছে।

শরৎচন্দ্রের আবেগ-অভিজ্ঞতা, সবকিছু বাঙালি জীবনের সীমার মধ্যেই আস্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েছিলেন। [৩] তিনি তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে সর্বতোভাবে রূপায়িত করেছেন বাঙালির ঘরের বাইরের বিচিত্রমাত্রিক বিষয়। ভবিষ্যতে বাঙালির সমাজ ও পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে তাঁর উপন্যাসগুলোর মর্যাদার হানি ঘটবে কিনা সেটা ভবিষ্যতের বিশদ আলোচনার বিষয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর সাবলীল প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়ের গুণে তাঁর সময় থেকে এখন পর্যন্ত বাঙালির হৃদয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন একথা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসঃ

[১] 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'; ক্ষেত্রগুপ্ত; গ্রন্থ-নিলয় প্রকাশনী। (১৩৫৮, ১৭ আশ্বিন, ১ম প্রকাশ, কলকাতা)

[২] 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী); শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ; ১ম সংস্করণ।

[৩] 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'; শ্রীভূদেব চৌধুরী; পঞ্চম সংস্করণ; পুঁথিঘর প্রকাশনী; কলকাতা।

[৪] উইকিপিডিয়া

[৫] গোকুল চন্দ্র রায় সম্পাদিত, 'শরৎচন্দ্র', ২য় খন্ড, 'নিজের উপন্যাসের উপাদান', কলকাতা, ১৯৬৬।

[৬] সুবোধ দেবসেন, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ', কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯।

বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসঃ আহমদ ছফা নির্দেশক লিটমাস টেস্ট

রমতুল্লাহ লিখন

"বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। এখন যা বলছে, শুনলে বংলাদেশের সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন আসবে না।" কথাগুলো কার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আহমদ ছফাকে কি, তাঁর লিটমাস টেস্ট বলা যায় এই কথাগুলোকে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের কঠোর ভাবে সমালোচনা করার সাহস একমাত্র আহমদ ছফাই দেখিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করেন তো তাহলে আহমদ ছফা কে?

আহমদ ছফা একজন আমজনতার বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ভেতর কেন এই বিভেদ করলাম। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব, স্বাধীনতাকালীন, স্বাধীনতা পরবর্তী যে বুদ্ধিজীবী সমাজ চলে আসছে তাঁর সিংহভাগই সমাজের এলিটদের জন্য কথা বলেছে। গণ মানুষের কথা রাখ ঢাক ঘোমটা ছাড়া বলেছেন এমন বুদ্ধি বেঁচে খাওয়া লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আহমদ ছফা অবশ্য এলিটদের ধার ধারেন নাই কখনই। তাই তিনি আপামরের বা আমজনতার বুদ্ধিজীবী। নিবন্ধের শুরুতেই আহমদ ছফাকে নিয়ে নিজের কিছু ভূমিকা লিখতে চাআহমদ ছফা একটা চেতনার নাম। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, গণবুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী, ভবিষ্যতদ্রষ্টা। তাঁর লেখা পড়লেই তৈরি হয় সত্যের উন্মাদনা।

তাঁর লেখাগুলা নিয়ে ভাবতে গেলে চিন্তায় অনুবিশ্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে স্বপ্ন দেখতেন আর সেই স্বপ্ন দেখাতে ভালবাসতেন পাঠকদের। তিনি আমাদের দেশের বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একজন যিনি শিল্প সাহিত্যের যে ধারাতেই গা ভাসিয়েছেন সেখানেই তাঁর অসামন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, অনুবাদ,ইতিহাস, স্মৃতিচারণ সহ প্রায় সব স্তরেই রেখে গেছেন তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ছাপ। তাঁর লেখাগুলোর ভিতর একটি ব্যপার লক্ষণীয় যে শুধু গ্যাদ্যাদে কিছু গল্প নয় বরং ধাক্কা দেবার মত শক্তি প্রতিটা লেখার ভিতর থাকে। মন জগতে ঝড় তুলতে তাঁর লেখাগুলো অনবদ্য। তাঁর দূরদর্শীতার প্রচন্ড হুঙ্কার শুনতে পাই তাঁর প্রবন্ধগুলোতে। তাঁর গল্পগুলো কথা শিল্পী হিসাবে তাঁর পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন সাহিত্যের প্রতিটা অলিতে গলিতে। তাঁর লিখনীর প্রচন্ডতার পরিচয় পাই সর্বোপরি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতেই। নিবন্ধের শুরুতেই আহমদ ছফার বিষয়ে যে পরিচায়ক উক্তিটি করেছিলাম সেটি হয়তো তাঁর সঠিক মান

নিরূপণ করে নাই। আসলে তিনি শুধু আমাদের দেশের নয় বরং সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য এক অকৃত্রিম স্বপ্নদ্রষ্টা।

১.

আমার এই নিবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আহমদ ছফার একটি বিখ্যাত রচনা "বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস" পাঠ পরবর্তী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছফার ভাবনা চিন্তার কিছুটা কাঁটা ছেড়া করা, সাথে দূরদর্শিতা, দর্শন, ভাবনা, বিচক্ষণতা, দৃষ্টিভঙ্গী, সৎ সাহস সহ আর অনেক কিছুই আমাদের মত করে পাঠকেকের সামনে নিয়ে আসা।

"আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন আমাদের রক্ত দিয়ে ভাবতে হচ্ছে। চারিদিকে এত অন্যায়, অবিচার এত মূঢ়তা এবং কাপুরুষতা ওঁৎ পেতে আছে যে এ ধরনের পরিবেশে নিতান্ত সহজে বুঝা যায় এমন কথাও চেঁচিয়ে না বললে কেউ কানে তোলে না"

১৯৭২ সালে প্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭ কিস্তিতে দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায়। তিনি লেখাটি লিখেছিলেন অনেকটা বাধ্য হয়ে। স্বাধীনতার অব্যবহিত সময়ে তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁর স্নায়ুতন্ত্রের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তা থেকে বাধ্য হয়ে তিনি এই রচনাটি লিখেন। রচনাটি বই আকারে প্রকাশিত হবার পর লেখকের কথা অংশে ছফা বলেছেন "আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন আমাদের রক্ত দিয়ে ভাবতে হচ্ছে। চারিদিকে এত

অন্যায়, অবিচার এত মূঢ়তা এবং কাপুরুষতা ওঁৎ পেতে আছে যে এ ধরনের পরিবেশে নিতান্ত সহজে বুঝা যায় এমন কথাও চেঁচিয়ে না বললে কেউ কানে তোলে না" তাঁর এই জ্বলন্ত বক্তব্য শুধু সেই সময়কেই নয় ববং আজও সমাজের চালচিত্রের একটি সত্য রূপের প্রকাশ। এখন আমাদের সমাজে সত্য সহজকে ধারণ করতে নানা প্রতিকূলতা অত্যাচার সহ্য করতে হয়। বিশেষ করে সাধারন জনতার জন্য তা একশ ভাগ সত্য। ছফার এই সাবলীল ভঙ্গিমায় সত্য বলাই তাকে আলাদা করে রাখে সবার থেকে।

রচনাটির শুরু থেকেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের কাজের সমালোচনায় মেতেছেন ছফা। সোজাসুজি ভাবে তাদের বলেছেন সুবিধাবাদী। কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন স্বাধীনতার পুর্বে তাদের নিরবতা এবং স্বাধীনতার পরপরই তাদের ভোল্ট পালটে আবার স্বাধীন বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর সাথে গলা মেলানো। সব মিলিয়ে তাদের নিজ সুবিধায় এই বারবার রূপ বদলানটাকেই সামনে এনেছেন। এছাড়া তিনি বলেছেন বুদ্ধিজীবী মহলের দূরদর্শনহীনতার যে চিহ্ন ফুটে উঠে তা হল তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন ভাবতে যে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতা লাভ করতে হবে। কিন্তু জাতির বিবেক বলে যাঁদের বুঝানো হয় তারাই যদি ব্যর্থ হয় তাহলে কেমনে একটি জাতি দিক নির্দেশনা পাবে।

প্রশ্ন উঠে, তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসল কিভাবে? ছফা তার উত্তরও দিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি।এই যে জনগণের সাথে তাঁর একাত্মতা এটাই তাঁকে অন্য উচ্চতায় তুলে এনেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমান্বিত দিকটাই হল গণ মানুষের জন্য ভাবনা। ছফা যে শুধু বুদ্ধিজীবীদের সমলোচনা করে গেছেন তা নয় বারংবার বলেছেন, কেউ সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সেই দায় বরতায় সেই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উপরই। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন সেই সময়ের সমাজের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে যার ফলে ব্যক্তিকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এই যে দৈন্য দশা তাঁর একটি অতীত কারণ ঘটিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পাকিস্তান আমলের পর থেকে একটি এলিট সোসাইটি গড়ে উঠেছিল। সৃষ্টি করা হয়েছিল রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি পরিমন্ডল। ছফা বলেছেন এই পরিমন্ডলের আবহাওয়াই বুদ্ধিজীবীদের পা চাটা মনোভাবের ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করেছ। বিত্তের লোভে তারা অমেরুদন্ডী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে অবলীলায়। উর্দুকে চাপিয়ে দেবার যে দুঃসাহস পশ্চিমারা দেখিয়েছিল তাঁর মূলে এই পা চাটা বাহিনীর ক্রিয়াকলাপই সাহস জুগিয়েছিল। বুদ্ধিজীবীদের এই নির্জীব ভূমিকার জন্য আর একটি কারণ ছফা সামনে এনেছেন তা হল সৎ সাহিত্যের অভাব। বুদ্ধিজীবীরা মার্কিন ডলারে পুঁজিবাদী বইয়ের প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজ দেশেই। মৌলিক কোন সৎ সাহিত্যের রচনা করার সময় ও সাহস তারা করে উঠতে পারেন নাই। তারপরেই আসল আইয়ুব আমল। সৃষ্টি হল আমলা ও টাউট শ্রেণি। এই টাউট শ্রেণির প্রথম সারির লোক ছিলেন আমাদের তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা। তারাই আবার ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে মস্ত দেশপ্রেমিক বনে গিয়েছিলেন আমাদের স্বাধীনতার পর। এটাই ছফা মাথা ব্যাথার কারণ। গিরগিটির মতন রঙ

বদলানো বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে দেশকে নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ কাঠামো দিবেন তা নিয়ে ছফার ব্যাপক সংশয় ছিল। তাই তিনি মনে করতেন এই রকম মনোভাবের ব্যক্তিরা দেশের ইনটেলেকচুয়াল কাঠামোতে থাকলে তরুণ কিশোররা সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন। ছফার দূরদর্শিতার মান এখানেই স্পষ্ট। আমরা এই আমাদের সময়েও বুদ্ধিজীবীদের ভিতর সেই রকম শক্তপোক্ত কোন কাঠামোই দেখতে পাই না। সবটাই যেন টাল মাতাল এক নমঃ নমঃ শ্রেণি।

২.

ছফা সেই আমলেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ফাটল তুলে ধরেছিলেন যা আজ আমাদের সামনে প্রকট হয়ে দাড়িয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে দেশে প্রাইমারি স্কুল ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা একবেলা খেতে পান না। সে দেশের এক শ্রেণির কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কিভাবে বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পারেন? এই প্রশ্নের ভিতরেই তার উত্তর বিরাজমান। সেই ধারাপাতের ফল আমরা হাতে নাতে সামনে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সময়ে। এটা হল আমাদের সমাজের শিক্ষকদের ক্ষয়রোগ ছফার ভাষ্যতে যা এখন আমাদের সময়ে এসে প্রতিয়মাণ হয়ে গেছে। ছফা কখনই সবার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন নাই। তিনি সব সময় বলেছেন যাঁদের এগিয়ে আসা উচিৎ তারা যখন তা না করে সাবলীল জীবন যাপন করে শাসক শ্রেণির কাছে মাথা বেঁচে দেয়, আপামরের কাছে থেকে দূরে সরে যায়, সাধারণের দুঃখ কষ্টকে হেলা করে, তখনই সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোত নেমে আসে। যা দীর্ঘস্থায়ী।

৩.

ছফা কবি সাহিত্যিকদের দলের লোক হলেও তিনি ছদ্মবেশী কবি সাহিত্যিকদের ছেড়ে কথা বলেন নাই। স্পষ্টভাষী ছফা তাদের সরাসরি সমাজের সবচেয়ে নোংরা মানুষ বলেছে। আঘাত পাওয়ার মত কিছু নাই। তিনি সবাইকে বলেন নাই। যাঁদের উপর কিছু বলার দায়িত্ব বরতায় তারা যখন নিশ্চুপ থাকেন তখন তাঁর এ ধরনের কথা বলা সাজে অনায়াসে। তিনি সুবিধাবাদী কবি সাহিত্যিকদের, ছদ্মবেশী বুদ্ধিজিবীদের গণিকাদের সতিপনার সাথেও তুলনা করেছেন। এমন কাঠখোট্টা সৎ ভাষী লোক ইতিহাসে বিরল। আজকের আলোচ্য রচনায় নানাবিধ আলোচনার মাধ্যমে কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নাকানিচুবানি দেয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন অকপটে। আমি আমার এই নিবন্ধে এই সমলোচনার প্রসঙ্গ টেনে আনলাম ছফার সাহসী ব্যক্তিত্বের উদাহরণ স্বরূপ। আমাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা মক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ইতিহাস আমরা অনেক লেখকের লেখার মাঝেই পাই। কিন্তু ব্যতিক্রম হল ছফা, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বুদ্ধিজীবীদের আয়েশী জীবন যাপন আর মুক্তিযুদ্ধের করুণ কাহিনী বেঁচে বিদেশি সাহায্যে দিন যাপনের লজ্জার ইতিহাস তুলে এনে তাদের আসল চেহারা আপামরের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর সমালোচনায় ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবীদের দালালি ভয়ংকর ভাবে উঠে এসেছে।

৪.

আহমদ ছফার দূরদর্শিতাই শুধু তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখে নাই বরং সাথে কাজ করে তাঁর চমৎকার প্রাসঙ্গিকতা। অলোচ্য রচনা হতে দু একটি উদাহরণ সামনে টানলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাঁর কথা "আবার একটি বিশেষ শ্রেণি আছে যারা গালভরা চটকদার শ্লোগানে জনগনকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায় গ্যাঁট হয়ে বসে পাকিস্তানি একনায়কদের অনুকরণে চিন্তার স্বাধীনতা, জীবিকার স্বাধীনতা, কল্পনার স্বাধীনতা এক কথায় দেশের নামে সমস্ত মানবিক স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশে যদি তেমন ঘটে যায়, খুব বেশি অবাক বা বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। বুদ্ধিজীবীরা এই ফ্যাসিবাদিরা সহায়তা করেন।" এই পুরো বক্তব্যকে চোখ বুজে অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারব যে আহমদ ছফা কতটা প্রাসঙ্গিক ছিলেন আমাদের জন্য।

আরেকটি উদাহরণ টেনে আনলে আরও সুন্দর ভাবে মিলিয়ে নিতে পারবেন। তাঁর কথা "শিক্ষকরা উঁচু পদে চড়ার জন্য কর্তার তোষামোদ এমনকি ছাত্রদের ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পত্রিকাগুলো সেই পাকিস্তানি আমলের মত নোংরা প্রচারপত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। টেলিভিশন স্থুল রুচিহীন লোকদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কোথাও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃজনের তাগিদ, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীল চাহিদা কোন দাম পাচ্ছে না। কর্তার তোষামোদ ধরতাই বুলি কপচান দলাদলি, অবদমিত সাম্প্রদায়িকতা, পদের মোহ এসব প্রায় প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।" প্রতিটি শব্দ যেন আমাদের সমাজকে বিশ্লেষণ করে লেখা। মনেই হচ্ছে না অতীতের কোন লেখা। এতটাই প্রখর তেজোদ্দীপ্ত প্রাসঙ্গিক তিনি।

৫.

ছফা নবস্বাধীন বাংলাদেশে রেনেসাঁর স্বপ্ন দেখেছিলেন। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব কিভাবে প্রাচীন পৃথিবীর পরিবর্তন এনেছিল তা বলার ভিতর দিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছলেন বাংলাদেশ এমন এক বিপ্লব হবে যার সুফল সমাজের সব স্তর সমান ভাবে পাবে। এই স্বপ্নবাজ মানুষটিই আবার আশাহত হয়েছেন বিট্রিশরা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করে গেছেন তাদের চিন্তন পদ্ধতির অনগ্রসরমানতা নিয়ে। কিন্তু রেনেসাঁর সম্ভাবনার বালু যে চিকচিক করছে তা বলে যেতেও কখনও ভুল করেন নাই।

তাঁর মনুষ্যত্বের যে দিকটি আমাদের অনুকরণ করা তা উচিৎ তা হল গণ মানুষের জন্য শ্রদ্ধা। তিনি মনে করতেন মানুষকে সত্যিকারভাবে মর্যাদা না দিয়ে কখনই প্রকৃত শ্রদ্ধেয় সমাজ সৃজন করা সম্ভব নয়। এই সমাজ সৃজন করতে সাংস্কৃতিক ভাবে অগ্রসর হওয়াটা খুবই দরকারি। কিন্তু রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদই হল সংস্কৃতিক অগ্রসরণের পথে প্রধান বাঁধা। ছফা ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংসস্কার হতে সমাজকে বের করে আনার কথা অনবরত বলে গেছেন। কিন্তু তাতে আমাদের কর্ণপাত হয় নাই। জ্ঞান চর্চায় মাতৃভাষার চর্চাকে অতি গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে এক কথায় প্রতিবাদেরই সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার কথা বলেছেন বাঙালিকে। বাঙালি সমাজের ভিতর যে ধর্মীয় ডগমা বা বদ্ধমত আছে তা অপসারণ জরুরী বলে তিনি মনে করেছেন। সংস্কৃতিজীবীদের সর্বদা দাস মনোভাব হতে বের হয়ে আসতে বলেছেন। এসবই ছিল তাঁর আলোচ্য রচনায় যে সংকটের কথা তিনি বলেছেন তা উতরে যাবার উপায়। এই যে উপায় বলে

দেয়া সমালোচনার মাধ্যমে তা ছফার প্রজ্ঞাকেই নির্দেশ করে। পাকা বীজ পাথরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই তরুণদের জন্য বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে তাঁর ইচ্ছা শক্তি ছিল অকল্পনীয়।

৬.

তাঁর অমর কথামালা থেকে ধার করে কিছু কথা দিয়েই শেষ করব আজ। তিনি বলেছেন "সৎ সাহসকে অনেকে জ্যাঠামি এবং হঠকারিতা বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু আমি মনে করি সৎ সাহস হল অনেক দুরবর্তী সম্ভাবনাকে যথাযথ ভাবে দেখতে পারার ক্ষমতা।" তাঁর কথা ধরেই বলি ছফা সৎ সাহসে বলীয়ান ছিলেন যা তাঁকে দূরদর্শী করেছে, করেছে অমর।

সব শেষেও মনে হবে সমুদ্র হতে এক বালতি পানি তুললাম মাত্র। ছফাকে কখনই সময়ের ফ্রেমে বন্দী করা যায় না, যাবে না। তিনি শুধুমাত্র একজন গণবুদ্ধিজীবী নন বরং তিনি হলেন অনন্ত সময়ের দিকনির্দেশক। তিনি যে সত্য চেতনার জন্ম দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যকর্মের মাঝে রাষ্ট্র সমাজ ক্ষয়িষ্ণুতার পথে পা বাড়ালেও তা থাকবে বর্ধিষ্ণু।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্নেল তাহের ও তৎকালীন রাজনীতি

প্রখর রুদ্র

দ্বিতীয় পর্ব

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। একাত্তরের সেই রাজনৈতিক জনযুদ্ধে বাঙালিরা সদ্য বিজয়ী হয়েছে। ভেতরের অনুপ্রেরণা থাকায় এই যুদ্ধে প্রায় সকলেই শামিল হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই যুদ্ধে যেমন অংশ নিয়েছিল জাতীয়তাবাদীরা, তেমনি সমাজতন্ত্রীরা। স্বাধীন হওয়ার পর এই বিভাজনটা খুব সূক্ষ্মভাবে পরিস্ফুট হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে আপামর জনসাধারণ অংশ নিয়েছিল মূলত পুরাতন ব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্যই, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নয়। আমরা জানি, সে সময়কার জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের হাতেই নেতৃত্ব ছিল। অবশ্য তাদের ভেতরেই এমন অনেকে ছিলেন যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই দুই বিভাজনের মধ্যেও আরো জটিলতা সৃষ্টি করেছে আপসকামী অংশটি। খন্দকার মোশতাক ছিলেন এদের পুরোহিত। দেশের হিতের চেয়ে, ক্ষমতার ভীত পোক্ত করতেই সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতেন তারা। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে দেশ স্বাধীনের পূর্বে যেমন, তেমনি পরেও এদের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

মুজিববাহিনী সম্বন্ধে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি। এই মুজিববাহিনী স্বাধীনতার পরেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত এই বাহিনী আপসপন্থী ও আপসবিরোধী দুই পক্ষের মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিল। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, তাদের আচরণে সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে যেরকম মারমুখী ভঙ্গি পরিলক্ষিত হতো, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধেও ততোটা ছিল না। তারা যুদ্ধের পর তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরানোর জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল। কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে এদের দেখা যায়নি। তারা তাদের দেনদরবার, কোন্দল এবং ক্ষমতার বাটোয়ারা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর এই মতের সাথে আমরা পুরোপুরি একমত পোষণ অবশ্যই করব না। মুজিববাহিনীর অনেকেই দেশপ্রেমিক ছিলেন, তারা স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন অনেক আগে থেকেই দেখেছেন। কিন্তু অস্বস্তিকর হলেও কর্নেল জামানের মূল্যায়ন অসত্য নয়। কিছু কম আর বেশি এই যা।

এরকম একটা পট পরিসরে দেশে ফেরেন কর্নেল তাহের। আমরা জানি, মহান মুক্তিযুদ্ধে ১১ নং সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বপালনের সময় সম্মুখযুদ্ধে আহত হন তিনি। দীর্ঘদিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। অসুস্থতার জন্য কর্নেল তাহের দেশে ফেরেন বেশ বিলম্বে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে দেশে ফেরেন তিনি। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নব্য সেনাবাহিনী তখনো সুসংগঠিত হয়নি। কর্নেল তাহেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল এর দায়িত্ব দেয়া হয়। সেসময় শৃঙ্খলা রক্ষাই শুধু নয়, বরং সার্বিক সমন্বয়ের দায়ভারও মুখ্যত তাঁরই স্কন্ধে বর্তায়। অবশ্য খুব বেশিদিন তিনি এ পদে ছিলেন না। দ্রুতই তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি চুয়াল্লিশতম ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার এবং কুমিল্লা ক্যান্টমেন্টের স্টেশন কমান্ডার হিসেবে

“নীতি নির্ধারকদের এ কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মতো আরেকটি বৃহৎ অনুৎপাদনশীল, গণবিচ্ছিন্ন ব্যারাক আর্মি নয়, একটি ছোট আকারের উৎপাদনমুখী গণবাহিনী গড়ে তোলাই হবে যুক্তিযুক্ত।”

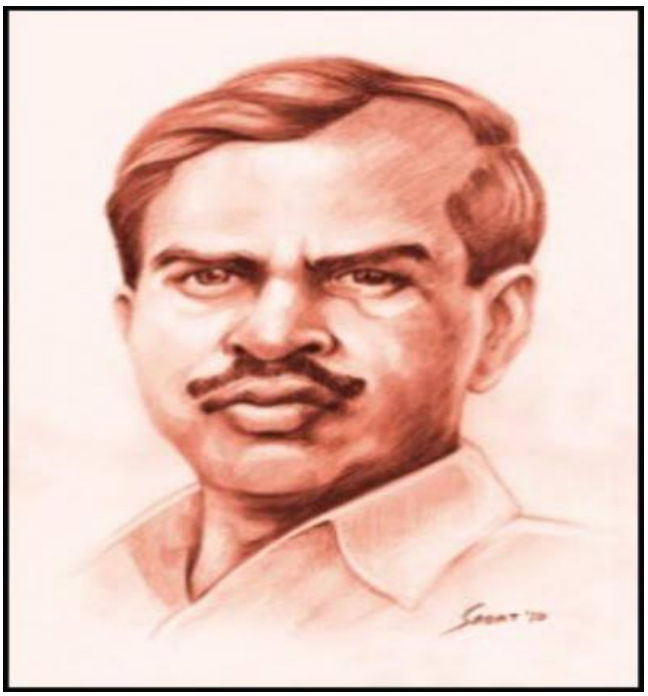

দায়িত্ব পালন করেন। কর্নেল তাহের মনে করতেন শৃঙ্খলার মাধ্যমেই একজন মুক্তিযোদ্ধার, একজন দেশপ্রেমিকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তিনি পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট হন, তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে চান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ড. আনোয়ার হোসেন লিখেছেন, “নীতি নির্ধারকদের এ কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানি

সেনাবাহিনীর মতো আরেকটি বৃহৎ অনুৎপাদনশীল, গণবিচ্ছিন্ন ব্যারাক আর্মি নয়, একটি ছোট আকারের উৎপাদনমুখী গণবাহিনী গড়ে তোলাই হবে যুক্তিযুক্ত।”

সেনাবাহিনীতে থেকে এ ধরনের ভাবনা ভাবাই তখনকার দিনে রীতিমতো দুঃসাহসের কাজ ছিল। কারণ সেনাবাহিনীকে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমল থেকেই অপছন্দ করতেন। তাঁকে অনেকবার কারাগারে পাঠানোর নেপথ্যে তো এই সামরিক সরকারই ছিল। তাই সেনাবাহিনীকে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে গ্রহণ করতে পারতেন না। তাহের যে প্রস্তাব করেছিলেন সেগুলো কিন্তু অবাস্তব ছিল না, বরং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ও কালের বিচারে সঠিকই ছিল। প্রতিরক্ষা নীতি ও প্রতিরক্ষা কাঠামো সম্পর্কিত যে পরিকল্পনা তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন তার সারবক্তব্য ছিল এরকম :

১. জনবিচ্ছিন্ন সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা যাবে না।
২. গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে এই সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে
৩. সিপাহী ও অফিসারদের মধ্যে দাসসুলভ বৈষম্য রাখা চলবে না
৪. অফিসার ও সৈনিকদের পৃথক নিয়োগব্যবস্থা রদ করতে হবে
৫. সামরিক বাহিনীকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করতে হবে।

দুঃখজনক হলে এটাই সত্যি যে তাঁর একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি। এটি জাতির দুর্ভাগ্য। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ছয় দফার সময় একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। রক্ষীবাহিনীকে তিনি সেরকমই একটি আধা সামরিক বাহিনী হিসেবে গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর কর্মকান্ড দেখে যে কেউই সেসময় ভীত থাকত। জনমনে ও সেনাবাহিনীর মধ্যেও ক্ষোভ ছিল। আবার এক ধরনের সন্দেহও ছিল। তাহের দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এভাবে ক্যান্টনমেন্টে থেকে গেলে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না। কারণ যাবতীয় পথ রুদ্ধ। সেজন্য ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনীতি নতুন মোড় নেয়ার প্রস্তুতি শুরু করে।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চলচ্চিত্র রিভিউ

চলচ্চিত্র: নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ

পরিচালনা: মাসুদ পথিক

সংগীত: সাইম রানা

অভিনয়: জুয়েল জহুর, শিমলা, মামুনুর রশীদ, আফফান আহমেদ, এহসানুর রহমান, প্রবীর মিত্র, বাদল শহীদ, রানী সরকার, রেহানা জলি, অসীম সাহা, নির্মলেন্দু গুণ প্রমূখ।

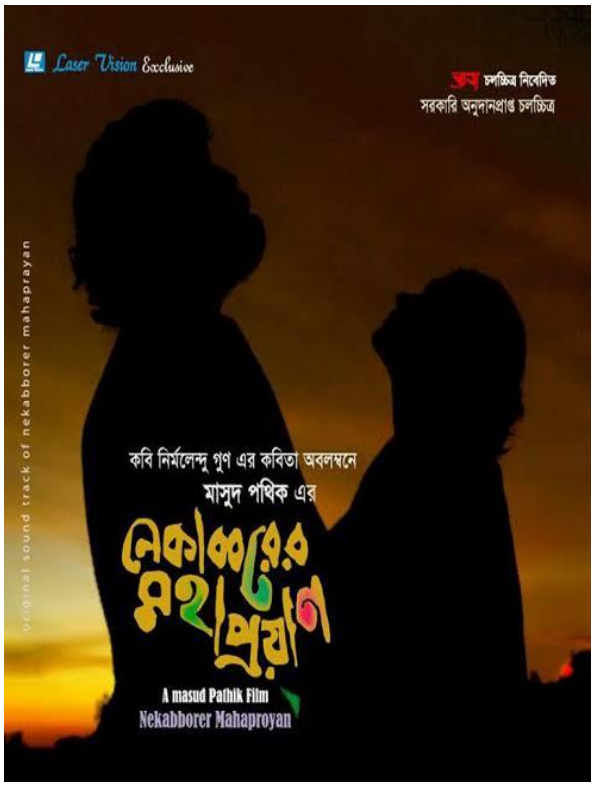

গ্রামীণ প্রকৃতি ও জীবনের বিদ্রোহী রূপ

ইয়াসির আরাফাত

কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা অবলম্বনে নির্মিত 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ' চলচ্চিত্রটি একালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র গুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রটি শুধু প্রকৃতিপ্রেমী নেকাব্বরের জীবন আখ্যান নয়, বাংলাদেশের শোষিত শ্রেণির মানুষের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম দলিল। চলচ্চিত্রটির প্রেক্ষাপট প্রত্যন্ত গ্রামবাংলা। সময় সত্তরের দশক। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও গ্রামাঞ্চলের কিছু ভূস্বামীরা শোষকের ন্যায় আচরণ করত। তাদের প্রবল বঞ্চনার শিকার হতো সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক। কৃষকদের কষ্টার্জিত আয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করত জমির মালিকেরা। এমনই একটা গ্রামের জমিদার তালুকদারের বিপক্ষে সোচ্চার হয় নেকাব্বর ও অন্যান্য সাধারণ কৃষক। তালুকদার তাদের বিরুদ্ধে মামলা করলে তার প্রেমিকা ও সর্বক্ষণ সুখ-দুঃখের সাথী

ফাতেমাকে রেখে গ্রামছাড়া হয় নেকাব্বর। তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এক পা হারায় নেকাব্বর। এর ৪২ বছর পর নিজ গ্রামে ফিরে আসে সে। কিন্তু ততদিনে নদীভাঙনে ও আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া লেগে তার সেই চিরপ্রিয় গ্রামের রূপ উধাও। গ্রামের এক প্রবীণার কাছে সে জানতে পারে ফাতেমার নির্যাতিত হওয়ার মর্মন্তুদ বিবরণ। তারপর চিরাচরিত নিয়মে বার্ধক্যে নত হয়ে, অসংখ্য রোগে ভোগার পরে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় নেকাব্বর। চলচ্চিত্রটি এখানেই শেষ, কিন্তু তারপরেও আমাদের মানসপটে আঘাত করার মতো যে বার্তা দিয়ে যায় সিনেমাটি তার জন্য পরিচালককে সাধুবাদ জানাই।

এই চলচ্চিক্ষটিতে শুধু যে গ্রামীণ ভূস্বামীদের অত্যাচার বা মুক্তিযুদ্ধকেই তুলে ধরা হয়েছে তা নয়। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেশ বা দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করে সেটাও এই চলচ্চিত্রের অন্যতম একটি উপজীব্য বিষয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নেকাব্বরের পরিণতি আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন রেখে যায়, "আমরা কি আসলেই পেরেছি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ

মূল্যায়ন করতে?"

কাহিনীর মতো চলচ্চিত্রটির গানগুলোও চমৎকার। সিনেমার আবহের সাথে মিল রেখে যথাস্থানে গানগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এবং গানের সুরেও বৈচিত্র্যও আছে। আর একটা বিষয় যেটা না বললেই নয় সেটা হলো চলচ্চিত্রটির সংলাপ। কিছু কিছু সংলাপ দর্শকের মনে একটা দার্শনিক ভাব জাগ্রত করে। যেমন: একটা দৃশ্যে নেকাব্বর ও তার সহকর্মীর কথোপকথন:
"-কী ভাবতাছো নেকাব্বর?

-ভাবতাছি প্রকৃতির কী খেলা! একটা কীড়া (পোকা) বোঝে কী কইরা বাঁইচা থাহন যায়। ভালা কইরা বাঁচতে গেলে অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে একখান পুল বানান লাগে। অথচ আমরা মাইনষেরা ক্ষণে ক্ষণে অতীত ভুইলা যায়।"

আবার, নেকাব্বর ও ফাতেমার মধ্যে একটা সংলাপ এরকম:

"ফাতু, কইতে পারবি, মানুষ মইরা যায় ক্যান? মরণের পরে মানুষ কই যায়? পরকালে? বেহেশ্‌তে? এরপর কই যায়?

-আইচ্ছা, আমাগো হরিদাসরা মরলে কি বেহেশ্‌তে যাইবো?

-না, ওরা স্বর্গে যাইবো।

-বেহেশত আর স্বর্গ কি আলাদা?

-আলাদা। আবার একই। কিছু মাইনষে নিজের স্বার্থে আলাদা করছে।"

পরিশেষে এখানে মূল কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি,

"মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চায় না সুদূরে চলে যেতে,
নেকাব্বর ভাবে,
অজানা অচেনা স্বর্গে বুঝি মেটে
বাস্তবের তৃষ্ণা কোনোদিন?
তবু তারা চায়, তারা কেন চায়? তারা কেন চায়?
কেন চায়?"

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বই: পদ্মা নদীর মাঝি
লেখক: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত)
বইয়ের ধরন: আঞ্চলিক উপন্যাস
প্রকাশকাল: ১৯৩৬

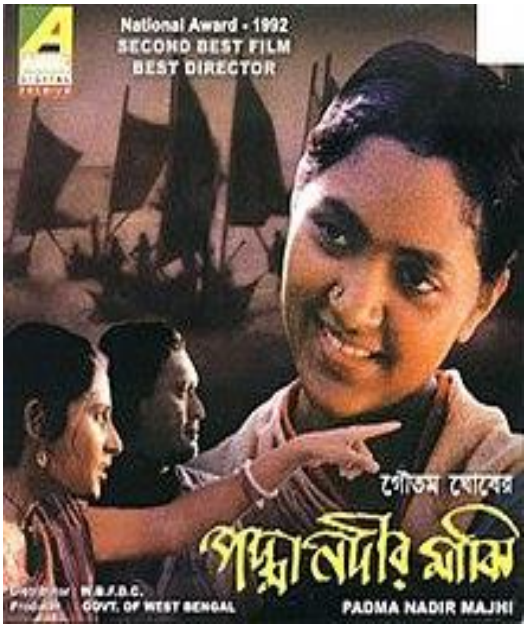

মিনহাজ আবেদীন জিদান

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও একাধিক বিদেশী ভাষায় অনূদিত জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। ভারতের একাধিক প্রাদেশিক ভাষাসহ ইংরেজি, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, রুশ, লিথুয়ানিয়ান, নরওয়েনিয়ান ও সুইডিস ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

মুভিচিত্ররূপ: বাংলাভাষায় নির্মিত বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথভাবে নির্মিত চলচ্চিত্র। বাঙালি কথা সাহিত্যিক 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' রচিত 'একই নামের' উপন্যাস অবলম্বনে 'গৌতম ঘোষ' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন।

চলচ্চিত্রের কলাকুশলীবৃন্দ: এই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচালক বাংলাদেশের রইসুল ইসলাম আসাদ, চম্পা, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (ভারত), উৎপল দও(ভারত), বিমল দেব(ভারত), সুনিল মুখোপাধ্যায়(ভারত), মমতা শঙ্কর(ভারত), হুমায়ুন ফরিদী, আজিজুল হাকিম, তন্দ্রা ইসলাম, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ অভিনয় করেন।

ছবির প্রধান চরিত্র সমূহ: কুবেরের চরিত্রের রইসুল ইসলাম আসাদ।

মালা: চম্পা
হোসেন: উৎপল দত্ত
কপিলা: রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন।

ছবির মুক্তিকাল: ১৬ই মে ১৯৯৩। দৈর্ঘ্য-১২৬ মিনিট।
দেশ-বাংলাদেশ, ভারত যৌথ প্রযোজনা। ভাষা-বাংলা।
পুরস্কার: ছবিটি বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দেশেই সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়।
সেরা পরিচালক: গৌতম ঘোষ(ভারত)
সেরা প্রযোজক: হাবিবুর রহমান (বাংলাদেশ)
সেরা অভিনেতা: রাইসুল ইসলাম আসাদ(বাংলাদেশ)
সেরা অভিনেত্রী: চম্পা(বাংলাদেশ)
সেরা মেক্যাপম্যান: মোহাম্মদ আলাউদ্দীন(বাংলাদেশ)
সেরা শিল্পনির্দেশনা: মহিউদ্দিন ফারুক(বাংলাদেশ)
সুরকার: আলাউদ্দিন আলী(বাংলাদেশ)

কাহিনীবিন্যাস: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কীর্তিনাশা পদ্মা নদী তার সংলগ্ন কেতুপুর ও পাশ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মানুষের জীবন ও জীবিকার চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে শহর থেকে দূরে দীন-দরিদ্র জেলে ও মাঝিদের হুবহু মিলে যাওয়া এক বিশ্বস্ত জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। মহাজনদের শোষণের চিত্রও ফুটে উঠেছে বইটিতে।

উপন্যাসের নায়ক অর্থাৎ প্রধান চরিত্র হতদরিদ্র কুবের 'পদ্মানদীর মাঝি'। অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরে কুবের। সংসারে তার স্ত্রী মালা, একমাত্র মেয়ে গোপী, তিন ছেলে ও বোনকে নিয়ে অতি কষ্টে তার জীবন চলে। মালা ছিল খোঁড়া। একমাত্র মেয়ে গোপী আর কুবেরের বোন ঘরের কাজ সামলায়।

স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে মালার বোন কপিলা এসে ঠাঁই নেয় কুবেরের দরিদ্র সংসারে। কপিলা তার রূপ-যৌবন দিয়ে কুবেরকে আদিম আকর্ষণে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। গড়ে তুলতে চায় আদিম, অসংস্কৃত ও নিষিদ্ধ প্রেম।
উপন্যাসটির অন্যতম চরিত্র হোসেন মিয়া। কেতুপুর এলাকায় দীন-হীন ও কপর্দকশূন্য এই লোকটির হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্তন ও জেলে মাঝিদের মাঝে পরম বন্ধুরূপে তার আবির্ভাব এক রহস্যের সৃষ্টি করে।

তাছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো: ধনঞ্জয়, শীতল, সিধুদাস, রামু, বৈকুণ্ঠ, অধর পীতম, হীরু প্রমুখ।
ব্যক্তিগত মন্তব্য: বাস্তবিক অর্থে উপন্যাস হবে উপভোগ্য, আনন্দসঞ্চারী ও আনন্দদানকারী। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' এমন একটি উপন্যাসের বই যার মধ্যে রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুণ। বইটি আমি যতবার পড়ি ততই যেন হারিয়ে যাই এর গভীরতায়। আমার কাছে উপন্যাস টির সার্বিক দিক এতটাই প্রাণবন্ত মনে হয় যেন আমি নিজে উপন্যাসের প্রতিটি জায়গায় উপস্থিত থেকে প্রতিটি ঘটনা নিজ চোখে অবলোকন করছি।

কপিলা কুবেরের আদিম আকর্ষণে তাদের নিষিদ্ধ প্রেমের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া। হোসেন মিয়াকে ঘিরে জেলে মাঝিদের রহস্যের জালবোনা, শোষক মহাজনদের শোষণের চিত্র সবমিলিয়ে উপন্যাসটির এই প্রাণবন্তভাব আমাকে বাধ্য করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সামনে যেতে এবং সম্পূর্ণ বইটি উপভোগ করতে। আমার মতে লেখকের সফলতা তখনই আসে যখন পাঠককে সে তার শব্দের মূর্ছনায় বইয়ের ভিতর হারিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারে। এক্ষেত্রে 'পদ্মা নদীর মাঝি' বইটির লেখক জেলে পাড়ার মাঝি ও জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ যা কিনা প্রকৃতিগতভাবে সেই জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ তা এমনভাবে চিত্রিত করেছেন মনে হয় হুবহু জেলেদের জীবন চিত্রটাই বুঝি ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলো মুখের আঞ্চলিক ভাষা উপন্যাসটিকে আরো বেশি রোমাঞ্চিত করেছে। একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্বিক দিক বিবেচনায় 'পদ্মানদীর মাঝি' একটি সার্থক উপন্যাস। আমার পাঠক হৃদয় সার্থক এমন একটি চিরায়ত আঞ্চলিক উপন্যাস পড়তে পেরে।

প্রিয় উক্তি : ১. ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে এখানে তাকে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর
২. গরীবের মধ্যে সে গরীব, ছোট লোকের মধ্যে আরও বেশি ছোট লোক

আমার দৃষ্টিতে বইয়ের ভালো/খারাপ দিক: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির বড় একটি ভালো দিক হলো সহজ-সরল ভাষায়, যত্ন সহকারে উপন্যাসটির উপস্থাপনা। তাছাড়া বইটিতে রয়েছে কৃত্রিমতাবিবর্জিত আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ। উপন্যাসটিতে রয়েছে চিরায়ত বাংলার হতদরিদ্র মানুষের নিখুঁত জীবনচিত্র। তাদের অসহায়ত্বকে আমরা দূর থেকে কখনো উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু লেখক বইটিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে আমরা খুব সহজে কিন্তু গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটি বারবার পড়েও আমি বইটির কোন খারাপ দিক খুঁজে পেলাম না। আসলে কি করে পাবো এটি যে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সার্থক উপন্যাস।
পাঠক কেন বইটি পড়বে: যে কোন মহৎ উপন্যাসই পাঠকের হৃদয়কে এক মহৎ আনন্দে আপ্লুত করে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মহৎ উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ করতে এই বইটি পড়া উচিৎ।

বইপ্রেমীদের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক উপন্যাসের কথা হলে প্রথমেই বইপ্রেমীদের মুখে আসে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির নামকরণ। হতদরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র, উপন্যাসের চরিত্রগুলোর কৃত্রিমতাবর্জিত আঞ্চলিক ভাষা, উপন্যাসের স্থান-কালের বর্ণনা সব মিলিয়ে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি'।

তাছাড়া উপন্যাসের নায়ক কুবের আর কপিলার আদিম আকর্ষিত প্রেমের শেষ পরিণতি কি হয়? রহস্যময় হোসেন মিয়ার রহস্যের উদঘাটন করতে পাঠককে অবশ্যই পড়তে হবে 'পদ্মা নদীর মাঝি'।

রেটিং: 'পদ্মা নদীর মাঝি' বইটি আমি যতবার পড়ি ততবারই মুগ্ধ হই। সেই মুগ্ধতার রেশ ধরে আমি বইটির রেটিং দিব ১০/১০।

শিক্ষার্থী: যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

বুক
রিভিউ

বইয়ের নাম: তোত্তোচান
লেখক: তেৎসুকী কুরোয়ানাগি
অনুবাদ: চৈতী রহমান
দ্যু প্রকাশন (জুন ২০১৯)
মূল্যঃ ২৫০টাকা

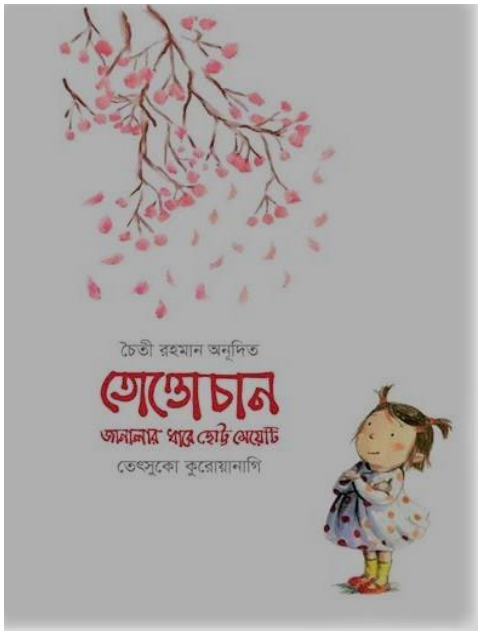

নওরীন সুলতানা

এই বইটি নিয়ে রিভিউ লিখতে গিয়ে ইচ্ছে করছে, বইয়ের প্রতিটি লাইনের রিভিউ লিখি। তোত্তোচান মূলত একটি জাপানি ভাষায় লেখা বইয়ের বাংলা অনুবাদ। সাধারণত অনুবাদ পড়তে গিয়ে যে অসুবিধাগুলোর সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি তার মধ্যে অন্যতম হল ভাষার আক্ষরিক অনুবাদের ফলে বই পড়তে বিরক্তি তৈরি হওয়া। কিন্তু এই বইটির অনুবাদ এতটাই গোছানো যে, বইয়ের শুরুটা আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে শেষ অবধি।

তোত্তোচান বইটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানে একটি স্কুল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষায়িত করে লেখা। এত বছর আগের ঘটনা হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি ও দিক-নির্দেশনাগুলো আজকের সময়ের প্রেক্ষাপটেও সমুজ্জ্বল ও অক্ষয়। বইটি পৃথিবী জুড়ে মানুষের চিন্তার জগতে দাগ কেটেছে।

ছোট্ট শিশু তোত্তোচান। ওর সম্পর্কে বইয়ের প্রতিটি লাইন পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছিল ও যেন আমার সামনেই ছোট্ট চুল দুলিয়ে ঘুরঘুর করছে। মনে হচ্ছিল যেন, একটু ওর গাল ধরে আদর করে দেই। জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিল তোমায়েগাকুয়েন নামের একটি স্কুল। স্কুলটি ছিল যেন একটি রেলগাড়ি। সেই স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহোদয় নিজ হাতে স্কুলে গাছের চারা রোপন করেন এবং ক'দিন পর সেই চারাগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত। সেই স্কুলেই তোত্তোচান ভর্তি হয়েছে। স্কুলের

প্রধানশিক্ষকের কাছেই যেন, আমি শিক্ষকতার অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। প্রতিটি দৃশ্য যেন মনে হচ্ছিল চোখের সামনে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে, ইনক্লুসিভ এডুকেশন একটি স্বচ্ছ ধারণা আপনি এই বইটি পড়লে পাবেন।

তোত্তোচান বইটিতে দেখা যায়, একটি স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং অন্য শিক্ষকদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিশুদেরকে কিভাবে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বড় করে তোলা যায় সেই প্রচেষ্টা। কথায় কথায় প্রায়ই আমরা স্কুলের প্রধানশিক্ষকদের উদাহরণ টেনে আনি লিডারশিপের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে। আর তোত্তোচান বইটির মধ্যে দেখা যায় একজন প্রধান শিক্ষক কিভাবে সকলের সাথে কাজ করে সুশিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সামান্য কিছুতেই রাগ বা শাসন নয়, বরং একটি শিশুর ভুল আচরণকেও কিভাবে শিশুর মধ্য দিয়েই শোধরানো যায়, এই বই পড়ার মধ্য দিয়ে পাঠক অবশ্যই তা জানতে পারবেন। সংস্কৃতি ও পরিবেশের শিক্ষার মধ্য দিয়ে কিভাবে সামাজিকীকরণ হয়, কীভাবে জীবনব্যাপী শিখনের স্পৃহা শিশুর ভেতর তৈরি করে দেয়া যায়, কিভাবে সভ্য সমাজের সদস্য হিসেবে বেড়ে উঠতে হয়, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কিভাবে প্রযুক্তিগত, সামাজিক, মানবিক, নৈতিক চিন্তার বিকাশ ও পরিবর্তন করা যায়, এই বইটিতে সুস্পষ্টভাবে সেই বিষয়ে ধারণা দেয়া আছে। বলাবাহুল্য, শিশুদের লেখাপড়া প্রতিভা নিয়ে বড়দের মধ্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সেই বিষকাঁটা শিশুদের মনেও ঢুকিয়ে দেয়া নয়, বরং প্রতিটি শিশু কিভাবে একে অপরের সহযোগী ও বন্ধু হয়ে জীবনকে বিকশিত করতে পারে, সেই দিকনির্দেশনা এই বইটি থেকে পাঠকগণ জানতে পারবেন। শিশুদের শৈশব যেন আনন্দময় হয়ে উঠে, সেজন্য এই বইটি যেন আলাদা বার্তাই বহন করে নিয়ে চলে।

বিভাগীয় পড়াশোনার অংশ হিসেবে আমিও বেশ কিছুদিন একটি স্কুলে প্র্যাকটিকাম টিচার হিসেবে ছিলাম। সেখানে কিছু অব্যবস্থাপনা ও অযৌক্তিকতা আমার চোখে পড়লেও অনেক ভাবেই এড়িয়ে গিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে, কেন সেগুলো দূর করার একটু হলেও চেষ্টা করলাম না। শিশুরা ক্লাসে অনেক ভাবেই হীনমন্যতার শিকার হয়। এমনকি টিফিন খাওয়ার ক্ষেত্রেও। অথচ তোত্তোচানের স্কুলে সব বাচ্চাদের টিফিন "সমুদ্রের কিছ, পাহাড়ের কিছু"। বাহ্যিক বা শারীরিক অবয়বটাকে সেই স্কুলে সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের বাসায় বর্তমানে আমার আপুর ছোট্ট বেবিকেও আমি এখন আদর করে তোত্তোচান বলেই ডাকি। অনুরোধ করব, বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সমস্ত স্কুল শিক্ষক এবং শিশুদের অভিভাবকগণ যেন তথাকথিত গটবাঁধা বা ছকনির্ভর জীবন থেকে বেড়িয়ে এসে শিশুদের জন্য একটি সুন্দর জীবন তৈরি করে দেয়ার লক্ষ্যে এই বইটি অবশ্যই একবার হলেও পড়ে। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে আপনারা শিখতে সমর্থ হবেন, শিশুদের মধ্যে কারো সাথে কারো তিক্ত তুলনা নয়, বরং প্রতিটি শিশুর জ্ঞান, প্রতিভা, শিখন, মূল্যায়নের ধরণ আলাদা। আর শিশুরাই একে অপরের কাছ থেকে ভাল কিছু শিখে নিতে পারে। এমনকি শিশুদের ভেতর স্কুল থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও নৈতিকতার শিখন পাকাপোক্ত ও যথোপযুক্ত হলে, তারা বাড়িতে এই বিষয়গুলো চর্চা করেই, বরং বড়রাও শিশুদের এই নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা থেকে অনেক কিছু শিখতে

পারেন। সুতরাং শিশুরা যেহেতু ফুলের মত, তাই একটি ফুল যেভাবে আলো, পানির ও পর্যাপ্ত যত্নের কল্যাণে নিজের মত প্রস্ফুটিত হয়, ঠিক তেমনি একটি শিশুকে শিখনের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে নিজের মত বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে হবে।

আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব, সবাই এই বইটি কিনে পড়বেন এবং সংগ্রহে রাখবেন। এই বইটি নিজে পড়ে ছোট বড় সব পাঠকদের পড়তে উৎসাহিত করবেন, উপহার দেয়ার জন্য নির্দ্বিধায় নির্বাচন করা যায় এই বইটি। বইটি পাঠকের মনের খোরাকের পাশাপাশি জ্ঞানের দরজা একটু হলেও উন্মুক্ত করবে। বিশেষ করে, শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীগণ এবং যারা শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করতে আগ্রহী আশা করি তারা সবাই অবশ্যই এই বইটি পড়বেন। বইটি আমাদের বিচারশক্তি, চিন্তাশীলতা এবং বিবেচনার দ্বার উন্মোচিত করতে সক্ষম।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বইয়ের নাম: পল্লীসমাজ
লেখক: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

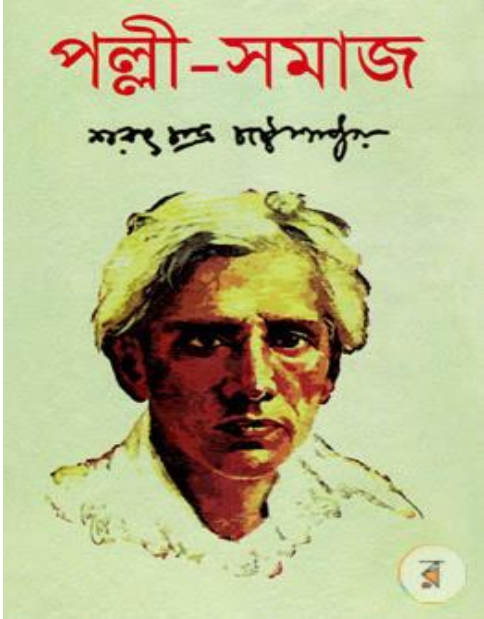

জান্নাতুল নওমী

শরৎচন্দ্র জন্মেছিলেন ব্রিটিশ ভারতে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে তৎকালীন সময়ের ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি সমাজ জীবনের চিত্রই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 'পল্লীসমাজ' শরৎচন্দ্রের সামাজ-সমালোচনামূলক একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তৎকালীন পল্লীসমাজের স্বরূপ উন্মোচনই 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের পটভূমি ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রভিন্স; অন্যসব গ্রামের মতো ক্রমবর্ধনশীল একটি গ্রাম কুয়াপুর। একশ' বছর আগে বলরাম মুখুয্যে তার বন্ধু বলরাম ঘোষালকে নিয়ে বিক্রমপুর থেকে এই গ্রামে আসেন। দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব বিবাদে রূপ নিয়ে তাদের পরস্পরের মুখদর্শন বন্ধ থাকলেও মৃত্যুকালে বলরাম মুখুয্যে নিজের সমস্ত সম্পদ নিজ সন্তান ও বন্ধুর সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তাদেরই উত্তরসূরী জমিদার তারিণী ঘোষাল ও যদু মুখুয্যের পারিবারিক কলহ ও শত্রুতাই হলো পল্লীসমাজের কাহিনী। পরিবার ও পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও উপন্যাসটি মূলত একটি সমাজকেই ফুটিয়ে তুলেছে। তারিণী ঘোষাল ও যদু মুখুয্যে দুজনেই গত হয়েছেন। রয়েছে তাদের উত্তরসূরী বেণী ঘোষাল; রমেশ ঘোষাল ও রমা মুখুয্যে।

পল্লী সমাজ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান চরিত্র তারিণী ঘোষালের একমাত্র পুত্র রমেশ। শহরে বেড়ে ওঠা শিক্ষিত; মার্জিত রুচির; কুসংস্কারমুক্ত এক তরুণ। পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতে কুয়াপুর গ্রামে আসলে শুরু হয় খলনায়করূপী সমাজকর্তা বেণী ঘোষালের ষড়যন্ত্র। বেণী ঘোষালকে কেন্দ্র করে রমেশকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হয় গোবিন্দ গাঙ্গুলী; ধর্মদাস; পরাণ হালদারদের মতো তৎকালীন সমাজপতিরা।

রমেশ তার বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্রের ঘটনা প্রথম টের পায় রমাদের বাড়িতে তার বাবার শেষ কার্যের জন্য নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে রমার মাসিমার কড়া জবাবে। আস্তে আস্তে রমেশ আরো জানতে পারে যে বেনী ঘোষাল আর গাঙ্গুলীদের মতো সমাজপতিদের উৎপীড়ন আর অত্যাচারে কতটা অতিষ্ট গ্রামের মানুষ। গাছ কাটা, মাছ ধরা ও অতিসামান্য বিষয় নিয়েও তারা সবসময় একে অপরের পেছনে লেগে থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য, ভুয়া মামলা এসব কিছুতে জুড়ি নেই সমাজপতিদের।

অন্যদিকে রমা ও রমেশের অন্তর্নিহিত আকর্ষণকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে লেখক উপস্থাপন করেছে সমকালীন পল্লীসমাজকে। যেখানে রমার প্রতি রমেশের অনুরাগ; বিশ্বাস অন্যদিকে রমেশের প্রতি বিপক্ষাচরণে রমার ইতঃস্ততভাব; সস্নেহ অনুযোগ; হিতকামনার সতর্কবাণী এসব কিছুর পেছনেই শোনা যায় এক গোপন প্রেমের পদক্ষেপ। কিন্তু পারিবারিক কলহ; বিষয়বুদ্ধি; কলংকভীতি; সামাজের রূঢ় বাস্তবতা; বৈধব্য সংস্কার এসবই তাদের প্রেমকে অবদমিত করে রাখে।তাই রমা সমাজপতিদের একজন হয়ে রমেশকে আঘাত দিয়েও বারবার সংশয়ে ভোগে। মূলত রমা ও রমেশ চরিত্রের মধ্যে রয়েছে বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এক সংঘাত। যেখানে বহির্দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ করে আর অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বকে করে স্রোত সংকুল। যা উপন্যাসটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

সমাজপতিদের হীনমন্যতা ও ষড়যন্ত্রের কুটিল-কঠিন আঘাত রমেশ কিংবা গ্রামের সাধারণ মানুষ কাউকেই মুহূর্তের জন্যে স্বস্তি দেয় না। রমেশ আবিষ্কার করে এসবই পল্লী সমাজের মানুষের অশিক্ষার ফল। জমিদার রমেশ গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের ব্রত গ্রহণ করে। এখানে শরৎচন্দ্র মুলত কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো; পল্লীসমাজে এক জমিদারের বিপক্ষে আরেক জমিদারকেই বেছে নেন। যার অবস্থান সমাজ সংস্কারের পক্ষে; জাতিভেদ প্রথার বিপক্ষে।

কিন্তু এত বিসর্জনের পরেও সেই গ্রামের মানুষরাই যখন তাকে ধোকা দিতে শুরু করে তখন রমেশ আবিস্কার করে যে, সমাজের উচ্চশ্রেণী কর্তৃক শোষিত নির্যাতিত নিম্নবর্গের মানুষজনও প্রকৃতিগত ভাবে এক ধরনের শঠ কিংবা বোকা। তাদের সম্পর্কে রমেশের ব্যক্তিগত মতামত এরকম-
"এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে, ভালো করলে গরজ ঠাওরায়, ক্ষমা করাও মহাপাপ; ভাবে-ভয়ে পিছিয়ে গেল।"

রমেশ তখন শহরে যাওয়ার পুরা বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও তার জ্যাঠাইমা বিশ্বশ্বরীর অনুরোধে তা পারে না। আমরা জানি, এই সমাজে যারা টিকে থাকতে পারে না তারাই সমাজ থেকে দূরেই চলে যায়। কিন্তু নানা জটিলতা পেরিয়ে রমেশ ঠিকই তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজের একজন হয়েই সমাজ সংস্কারক রমেশের এই এগিয়ে যাওয়া; অন্যদিকে রমশের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে বিশ্বেশ্বরীর নিয়ন্ত্রণ এবং রমার গতি এনে দেওয়া নিঃসন্দেহে পাঠক হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

চরিত্র বিশ্লেষণ ঃ

পল্লীসমাজ উপন্যাসে রমাই যেন শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কর্তব্য বিচক্ষণতা; বাস্তব বুদ্ধি; আঘাত অনুতাপ; প্রেম প্রয়োজন এবং পরস্পর বিপরীতমুখী সত্ত্বাই রমাকে করছে জীবন্ত।
অন্যদিকে রমেশও যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং জীবন্ত। চরিত্রগৌরবের দিক থেকে রমা অপেক্ষা রমেশই শ্রেষ্ঠ। রমেশ অপ্রতিরোধ্য শুভশক্তির আধার।
কিন্তু বিশ্বেশ্বরী যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটা জীবন্ত নয়। বেণীঘোষাল চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খল প্রকৃতির। এটি জীবন্ত হলেও একঘেয়ে। সর্বোপরি তৎকালীন পল্লীসমাজই যেন একটা চরিত্ররূপে উঠে এসছে উপন্যাসে।

শিক্ষার্থী: বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

গল্প

একটি চাঁদনীপসর রাত এবং অচিনপুরের কয়েকজন বাসিন্দা

শানিন হক

এখন মধ্যরাত। ছাদের কার্নিশ থেকে বারবার ভেসে আসছে দুঃখভরা কণ্ঠে উচ্চারিত একটি গান "চাঁদনী পসরে কে আমারে স্মরণ করে।" প্রতি ভরা পূর্ণিমার রাতেই মেঘের ওপরের বাড়িটা থেকে অগণিতবার ভেসে আসে এই গানের সুর। অচিনপুরের এই বাড়ির বাসিন্দা পাঁচজন। বাকের,মিসির আলি,হুমায়ূন আহমেদ, হিমু এবং শুভ্র। প্রথমদিকে বাকের একাই থাকতেন, বাকি চারজনের আগমন ঘটেছে বছর আটেক আগে। এখানে দিনকাল ভালোই কাটে তাদের। প্রায়শই গল্পের আসর বসে, গল্পের ঝুড়িতে ভারী হয় তাদের দিবস-রজনী।

আজও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। হিমুর গান শুনতে পেয়েই মিসির আলি আর শুভ্র দাবা খেলা অসমাপ্ত রেখে ছাদে উঠে এলেন। হিমুর পাশে বসে বাকের উদাস মনে সিগারেট ফুঁকছেন। মিসির আলির মনে হলো,বাকেরের চোখে-মুখে একটা অচেনা অনুভূতির ছাপ। কিন্তু কিছু না বলে তিনি সামিল হলেন মধ্যরাতের আসরে। এইসব রাতে কখনো হুমায়ূন আহমেদকে পাওয়া যায়না! তিনি মেঘের ভাঁজে ভেসে ভেসে পৃথিবীতে ফিনিক ফোঁটা জোছনা দেখতে যান। কারণ পৃথিবীর জোছনা নাকি

অনেকগুণ বেশি সুন্দর হয়।
বাকিরা বুঝতে পারে; বহুপুরোনো অভ্যাসের টানে যান! হিমুর গান শেষ হতেই শুভ্র বলে ওঠে, "হিমু ভাই, আপনি আমার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমার মা দারুণ গান গাইতেন। আমি তাকে বলতাম, বিয়ে করলো এমন কাউকে করবো যে তোমার মতো ভালো গান গাইতে জানবে। মা শুধু হাসতো। আমি বোধহয় খুব বোকা ছিলাম, তাইনা?" মিসির আলি বলেন, "মোটেই না, শুভ্র! তুমি একজন শুদ্ধতম মানুষ। তোমার মতো মানুষেরা পৃথিবীতে জন্মায় বলে পৃথিবী এত সুন্দর। শুধু দুঃখের বিষয় এটাই যে, এই ভালো মানুষগুলো পৃথিবী থেকে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়।" বলতে বলতেই হিমু

আবার গান ধরে "যে থাকে আঁখি পল্লবে তার সাথে কেন দেখা হবে?।" হিমু ছেলেটা এখানে এসে অনেকটা বদলে গেছে, এখন আর রোজ হন্টনে ব্যস্ত হয় না; এখন তার দরদভরা কণ্ঠ দিয়ে বিষাদ ঝরে পড়ে। এই বিষাদ কার জন্যে সেটাও সবাই বুঝতে পারে, কিন্তু বুঝেও দিব্যি না বোঝার ভান করে বেড়ায়। হিমু জানে, রূপা আজো সব জেনেশুনে নীল শাড়ি পরে সেজেগুজে ছাদের কার্ণিশে দাঁড়ায় শুধু তারই প্রতীক্ষায়। তখন হিমু ইচ্ছা করে যেতো না আর এখন ইচ্ছা হলেও যেতে পারেনা কারণ সে গেলেও রূপা তাকে আর কখনো দেখতে পাবেনা!এই তীব্র দুঃখগুলোই বিষাদ হয়ে হিমুর কণ্ঠে ঝরে আর মনে মনে ভাবে, "সে কি আদতে মহাপুরুষ হতে পেরেছিলো?" জগতের কিছু প্রশ্নের উত্তর বোধহয় কখনোই মেলে না, হিমুও ভেবে নিয়েছে এর উত্তর সে কখনোই পাবে না। গান শেষ হতেই মিসির আলি আর শুভ্রের করতালি পড়লো কিন্তু এই গানটা শেষ হবার পরও যখন গানপাগল বাকের ভাই প্রতিক্রিয়াহীন তখন মিসির আলিই জানতে চাইলেন তার কি হয়েছে। উত্তরে বাকের ভাই বললেন দীর্ঘ সাতাশ বছর পর আজ তার আকাশের ঠিকানায় একটি চিঠি এসেছে তাও আবার এক অপরিচিতার কাছ থেকে, সে তার সব প্রিয়জনের খবর দিয়েছে। বাকের ভাই অতি উৎসাহে বলে উঠলেন, "তোমরা পড়বা চিঠিটা? পড়ে শোনাবো?" বলেই পড়তে শুরু করলেন :

প্রিয়
বাকের ভাই,

আমার সালাম নিবেন! কেমন আছেন?
আমি কে? আপনি আমাকে চিনবেন না! ধরে নিন, আমি লীনা কিংবা বকুলের মতো আপনাকে গভীর শ্রদ্ধার আসনে বসানো কোনো মেয়ে অথবা কিছুটা মুনার মতো একজন মেয়ে যে প্রায়ই মনে মনে উচ্চারণ করে "বাকের ভাই, আপনি একজন চমৎকার মানুষ!"
পৃথিবীটা কি বিচিত্র তাই না, বাকের ভাই? আপনি যখন এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কোথাও বাস করছেন তখন এই ২০২০ সালে এসে এই পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে একজন সদ্য তরুণী আপনার কথা ভেবে আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখছে! ভাবা যায়?
আচ্ছা বাকের ভাই, আমার কেন মনে হয় আপনি ঐ দূরের আকাশে একটুও ভালো নেই? ওখানে তো মুনা নেই, মজনু নেই, আজিজ মিয়ার চায়ের দোকান নেই কিচ্ছু নেই! এসব ছাড়া বাকের ভাই বুঝি ভালো থাকতে পারে? আপনার মেঘের উপরের বাড়ি থেকে আপনি "হাওয়া মে উড়তা যায়ে" গানটা শুনতে পান তো রোজ? জানেন, আমি প্রায়ই এই গানটা শুনি! শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করলেই দেখি আপনি মহাখুশিতে আপনার হাতের ঐ চেইনটা বনবন করে ঘুরাচ্ছেন। আমার যখন খুব মন খারাপ হয়, আমি তখন 'কোথাও কেউ নেই' এর শেষ পর্বটা দেখি আর ভেউভেউ করে কাঁদি। বুঝলেন বাকের ভাই, কান্নায় বোধহয় ভাইটামিন আছে! হাহা, কাঁদলেই আমার চোখের পানির সাথে সব মন খারাপ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। ভালো বুদ্ধি না, বলেন?
আপনার জানতে ইচ্ছা হয় না, মুনা-বদি-মজনু-লীনা-বকুল-উকিল সাহেব-সোমা-রুমা-ঝুমা ওরা সব কেমন আছে?

আমি কিন্তু জানি, সবার কথা! শুনবেন?
মজনু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখন বড় চাকরি করে। আপনার কথামতো মুনা-ই অনেক কষ্ট করে চাকরি জোগাড় করে দিলো ওকে, বুঝেনইতো হাজার হলেও জেলখাটা আসামি মানুষ কি সহজে চাকরি দিতে চায়?জানেন,মজনু বিয়েও করেছে, একটা ছেলে হয়েছে। নামটা শুনলে আপনি অবাক হবেন! মজনু ছেলের নাম রেখেছে 'বাকের' এরচেয়েও মজার ব্যাপার হলো মজনু প্রায়ই নিজের ছেলে কে বাকের ভাই বলে ফেলে, এ নিয়ে কি যে হাসাহাসি হয়! আর বদি? বদির মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে, আপনার দেয়া সোনার চেইনটা সবসময় ওর গলায় ঝুলে। মায়ের মতোই দারুণ গান জানে! বদি আজও অনুশোচনার তাপে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এখন হাজার কাঁদলেও কি কিছু বদলাবে? মানুষ সময় গেলে সবই বুঝতে পারে, কিন্তু কিচ্ছু করার থাকে না! যাইহোক, লীনা-বাবু এখন মামার সাথেই থাকে; ওরা কত্ত বড় হয়ে গেছে! আপনি ওদের দেখলে চিনতেই পারবেন না! বাকিরাও যে যার মতো ভালো আছে। শুধু বকুল প্রায়ই আপনার কথা মনে করে খুব কাঁদে আর উকিল সাহেব প্রতিটা কেস জিতেই গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "এই জীবনে কতশত কেস জিতলাম কিন্তু একটা নিরপরাধ ছেলে কে বাঁচাতে পারলাম না!" সবাই কি সুন্দরভাবে বেঁচে আছে তাই না?কিন্তু একজনের এখনো 'কোথাও কেউ নেই!' সেই একজন হচ্ছে মুনা। এই মেয়েটা সেই চিরদুঃখীই রয়ে গেলো। আমি জানি, মুনার খবরটা পেয়ে আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু কি করবো বলুন? না বললেও আপনি খুশি হতেন না!

কে বললো বাকের ভাই'রা মরে যায়? এইচডি ভিডিও কিংবা নেটফ্লিক্সের ক্রেজও বাকের ভাই'কে হারাতে পারে না, পারবে না কোনোদিনও। 'বাকের ভাই' আপনি জনম জনম ধরে বেঁচে থাকবেন অগণিত মানবহৃদয়ের মণিকোঠায়। যেখানেই থাকবেন, সবসময় 'ভেরি ফাইন' থাকবেন বাকের ভাই!

ইতি,
আপনার একজন অনুরাগী

পড়া শেষ হতেই বাকের ভাইয়ের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। যে মানুষটাকে ওরা কখনো কাঁদতে দেখেনি, সে আজ কাঁদছে। এই কান্না যতটা দুঃখের তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দের। আজ এত বছর পরও পৃথিবীর মানুষ 'রাস্তার ছেলে' বাকেরকে ভালোবেসে মনে রেখেছে সেটা জানতে পেরেই চোখে জল এসেছে। ততক্ষণে শুভ্র বাকের ভাইকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদা শুরু করেছে, হিমু উদাস নয়নে কোথায় যেন তাকিয়ে আছে। যেন একটা দমকা হাওয়া এসে সবার অতীতকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলো। শুধু মিসির আলি গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, "নিঃসঙ্গতাপ্রিয় এই আমার বাকিদের মতো ফেলে আসা কেউ একজন থাকলে বোধহয় খুব মন্দ হতো না!"

মৃত্যু কি আদতে সবকিছু কেড়ে নেয়? মৃত্যু না থাকলে কেউ হয়তো জানতেই পারতো না যে তার জন্যে কত মানুষ আকাশসম ভালোবাসা পুষে রেখেছে!

শিক্ষার্থী: সরকারি জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ

একটা শাড়ির গল্প

রফিকুল নাজিম

মিথিলা এখনো কাঁদছে। রাত থেকে সে একই গতিতে কেঁদে চলেছে। অফিসে জরুরি মিটিং থাকায় আরাফকে বের হতেই হলো। বিয়ের পর এই প্রথম আরাফ নাস্তা না সেরে বাসা থেকে আজ বের হয়েছে। মিথিলা এখনো কাঁদছে। আপাততঃ মনে হচ্ছে এই কান্না ম্যারাথন টাইপ। আরাফ এই কান্নার রহস্য উন্মোচনের জন্য সেই রাত থেকে চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে এই ম্যারাথন কান্নার দূরত্ব মাপতে। কিন্তু সে পুরোপুরি ব্যর্থ! অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বাসা থেকে বের হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। যাবার সময় সে মিথিলাকে দরোজা আটকাতে বলে গেছে। কিন্তু বিছানায় বসে বসে এখনো মিথিলা কেঁদেই চলেছে।

সদর দরোজা খোলা দেখে রহিমা বিবি কটকট করতে করতে মিথিলার বেড রুমে সরাসরি ঢুকে গেলো। মিথিলাকে কাঁদতে দেখে রহিমা বিবি হা করে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাসায় সে দশ মাস তেইশ দিন ধরে আছে। কখনো মিথিলা ও আরাফের মধ্যে ঝগড়ার ঝ'ও সে দেখেনি। অথচ আজ তার আপামনি কিভাবে ঠুকরে ঠুকরে কাঁদছে! একটু দম নিয়েই রহিমা শুরু করলো

-আফা গো, এই পুরুষ মাইনসের জাতটাঐ খারাপ। বিয়ার আগে কত্তো মিঠা মিঠা কতা কয়। যহোন বিছানাত পাইয়া যায় গো আফা- তহোন নারীর মিঠা চিনিও হেগো কাছে নুনের মত তিতা লাগে! আমার রতনের বাপেও বিয়ার আগে আমারে লইয়া কত্তো জাগাত গেছে। এই ধরেন সিনামা হলে, ফুচকা খাইতে, লাল চুড়ি কিইন্না দিতে। আর বিয়ার পর এহোন আমারে আরে ঠারে কতা কয়। সুমোয় সুমোয় যেই মাইরটাঐ না মারেও গো আফা। পুরুষ মানুষ হারামিরজাত। একেকটা পাক্কা শয়তান।

রহিমার কথাগুলো মিথিলার কানে বিষের মত লাগছে। তাই সে তার দুই হাঁটুর মাঝখান থেকে মাথাটা তুলে রহিমা বিবিকে কষিয়ে একটা ধমক দেয়। রহিমা বিবি হঠাৎ ভূত দেখার মতই লাফিয়ে উঠে এবং বিড়বিড় করতে করতে রান্নাঘরের দিকে দ্রুত হেঁটে যায়। রহিমা বিবি কথা একটু বেশি বলে। তবে সে যা বলেছে একদম কড়ায়গণ্ডায় সত্যি। মিথিলাও তার কথায় মোটামুটি একমত। রহিমা বিবির কথাগুলো মিথিলার কানে বারবার অনুরণিত হচ্ছে। আর আরাফের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভের পারদটা তরতর করে ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে।

আরাফ অফিস গিয়ে কয়েকবার কল করেছে। কিন্তু মিথিলা মোবাইলটা হাতে নিয়ে কল কেটে দিয়েছে। মিথিলার মনে পড়ছে-কার মুখে যেন শুনেছে "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!" কথাটা একদম খাঁটি। গতরাতে যদি মিথিলা নিজ চোখে না দেখতো, তাহলে সারাজীবনেও আরাফকে চিনতে পারতো না। আরাফ এতোটা নীচ! দৃশ্যটা মনে আসতেই মিথিলার গা রি রি করে উঠছে। ছিঃ ছিঃ

এই না হলে পুরুষ মানুষ! এক নারীকে বুকে নিয়ে শুয়ে থেকে আরেক নারীকে কল্পনা করে! লোক দেখানো ভালোবাসার কারণ তো তাহলে এটাই। নিজের ইবলিশ রূপটাকে আড়াল করে রাখার জন্যই আরাফ বেশি বেশি ভালোবাসার অভিনয় করে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মিথিলা আরো দ্বিগুণ গতিতে-শব্দে কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদতে কাঁদতে মিথিলা তার মাকে বিকেলে এসে তাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

কলিংবেল বাজছে। কলিংবেল বাজতেই রান্নাঘর থেকে রহিমা বিবি দৌঁড়ে গিয়ে দরোজা খুলে দেয়। একজন লোক একটা পার্সেল তার হাতে দিয়েই চলে গেলো। মিথিলার ঘরে পার্সেলটা রহিমা বিবি রাখতে গেলো।

-আফা, আর কাইন্দেইন না তো। একদিনেই যদি এতো বেশি কান্দাইলে পরে আরো কেমনে কাঁনবেন? তার উপ্রে বেশি কাঁনলে নাকি চক্ষু কানা অইয়া যায়গা। পরে কিন্তু আর দুইন্নাডা দেখতেন পারতেন না। ও আফা, আপনের এই বাকশোটা আইছে। এইযে এইহানে রাখলাম।

মিথিলার চোখমুখ ফুলে গেছে। সে মুখ তোলে কটমট করে রহিমার দিকে তাকিয়ে আবার আগের চেয়ে দশ ডেসিবল জোরে ধমক দেয়। আকস্মিক ধমকে আবারো আঁতকে উঠে রহিমা। বাক্সটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে মিথিলার রুম থেকে বের হয়ে গেলো।

আরাফ বাসায় ফিরে এসে মিথিলাকে আগের মতই দেখতে পায়। এখনো কাঁদছে মিথিলা। তবে কান্নার গতি কিছুটা কম। জল পড়ার গতিতেও ভাটা এসেছে বোধ হয়। যাই হোক। আরাফ নিজে শাওয়ার শেষ করে ড্রয়িং রুমে কিছু একটা করছে। সাথে হাত লাগিয়েছে গাড়ির ড্রাইভার রুবেল। রহিমা বিবিও টুকটাক জিনিসপত্র এগিয়ে দিচ্ছে। ড্রয়িংরুমের কাজ শেষ করে আরাফ রুমে গিয়ে মিথিলার পাশে গিয়ে বসলো। মিথিলার মাথায় হাত রাখতেই সে হাত সরিয়ে দেয়। আবারো মিথিলার মাথায় হাত রাখে আরাফ। কিন্তু বরাবরের মতই মিথিলা সরিয়ে দেয়। উজানের ঢল নামে চোখে। এবার আরাফ মিথিলাকে জাপটে ধরে।

-কেন এমন পাগলামী করছো, মিথি? কি হয়েছে বলো, প্লিজ। তোমার চোখের জল আমাকে তো অপরাধী করে দিচ্ছে।

-ওহ, অপরাধী লাগছে বলছো! তুমি তো প্রতারক। তুমি আমাকে ঠকাচ্ছো, আরাফ। তুমি আমার সরল বিশ্বাসের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করছো।

-কি আবাল তাবোল বকছো! তুমি ঠিক আছো তো, সোনা!

-ও এখন তো আমি আবোলতাবোল বলবোই! আমি তো পাগল।

-সোনা, কে বলেছে তুমি পাগল? পাগল আমি। পাগল তো আমার চৌদ্দগুষ্টি। এখন বলো, প্লিজ। কি হয়েছে তোমার, কেন এভাবে কাঁদছো?

-গত রাতে আমি নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। তুমি আমার সাথে শুয়ে আরেকটা মেয়ের সাথে.....! ছিঃ ছিঃ আরাফ!

-আরেকটা মেয়ে মানে! কি বাজে বকছো, মিথিলা।

-কেন! অবাক হচ্ছো। তুমি ধরা পড়ে গেছো, আরাফ। লুকিয়ে লুকিয়ে সারারাত তুমি মোবাইলে সেই মডেল মার্কা মেয়ের ছবি দেখোনি? কত রঙের শাড়ি পরা ছবি! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখছিলে তুমি। ছিঃ ছিঃ তুমি এতোটা জঘন্য!
আরাফ হাসছে। হাসতে হাসতে মিথিলার বুকে শুয়ে পড়ছে বারবার। মিথিলা কিছু বুঝতে পারছে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আরাফের বিদঘুটে হাসি সহ্য করছে। কিছুটা সময় নিয়ে আরাফ মিথিলাকে মোবাইলে রাখা সেই মেয়ের ছবিগুলো ভালো করে দেখায়। ঝড় কিছুটা গতি হারায়। এই মহাদুর্যোগেও মোবাইলে সংরক্ষিত ছবিগুলোই সুন্দরবনের মত বুক পেতে দাঁড়ায়।

-মিথি, তোমার মনে আছে আজ কত তারিখ? আজ আমাদের প্রপোজ ডে। এইদিন তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিলে। আমার মত চালচুলোহীন একটা ছেলেকে। তাই দিনটাকে সেলিব্রেট করার জন্য অনলাইনে ঢুঁ মারছিলাম। অবশেষে একটা বুটিক হাউজে তোমার জন্য একটা শাড়ি অর্ডার করলাম। আর ঐ বুটিক হাউজের সব শাড়ির মডেল ঐ একটা মেয়েই!
দুই পাটি দাঁতের মাঝখানে জিহ্বা রেখে মিথিলা বললো,
"স্যরি, বাবুটা। সারাদিন কিছু খাওনি? মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে আমার বাবুটার! আচ্ছা, দুই মিনিট বসে। আমি মুখে পানি দিয়ে আসি। আমারও খুব খিদে পেয়েছে।"

আরাফের বুকে মাথা রেখে মিথিলা রুম থেকে বের হয়ে আসে। রান্নাঘর থেকে হা করে তাকিয়ে আছে রহিমা বিবি। বিড়বিড় করে কিছু একটা যেন সে বলছে! কিন্তু কথাগুলো অস্পষ্ট। ড্রয়িংরুমে গিয়ে মিথিলা তো পুরো তাজ্জব বনে গেলো। কেক, ফুল, বেলুন, রিবন দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে রুমটা। উৎসবের আবহটা ঘরে তুলে এনেছে আরাফ। আরাফ পার্সেলের বক্সটা খুলে দেয় মিথিলাকে। চমৎকার একটা শাড়ি। হ্যাঁ রাতের ঐ মেয়েটাই তো শাড়ির প্যাকেটের গায়েরও মডেল। মিথিলা লজ্জায় মুখ গুঁজে দেয় আরাফের বুকে।
-তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো কেন, রাতিনের বাপ! আমি তো পাগল হয়ে যাচ্ছি!
মিথিলাদের দরোজায় ক্রমাগত কলিংবেল বেজেই যাচ্ছে। আমি শিওর-মিথিলার মা এসেছেন।

নরসিংদী

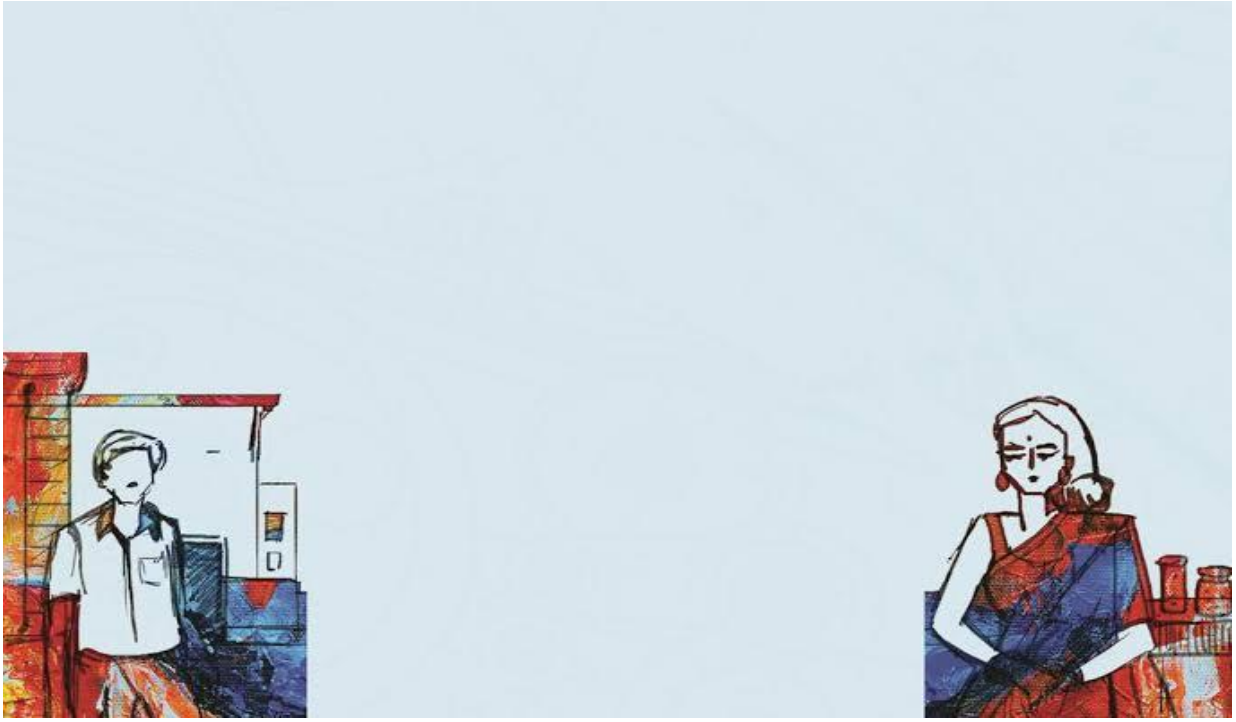

শেষটা কেউ জানেনা

জাহিদ

কম্বলে মুড়িয়ে থাকা সিয়াম গা থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসল।
চোখে ঘুম আসছে না তার। এক ঘন্টা যাবত চেষ্টা করেও চোখে ঘুম আনতে পারে নি।
ঘুমানোর কয়েকটা বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট করেছে কিন্তু কাজে আসে নি।
বিছানায় এদিক ওদিক হাত দিয়ে ফোন খুঁজে হাতে নিল। মধ্যরাত।
ঘড়িতে দেড়টা বাজছে।

বিছানা থেকে নেমে সিগারেট প্যাকেট আর দিয়াশলাই বাক্স হাতে বারান্দার দিকে গেল।
সিয়াম বিল্ডিং এর সপ্তম তলায় থাকে।
বারান্দা থেকে পুরো শহর দেখা যায়।
রাতের অবসরে নিয়ন আলোর শহর অবলোকন করা যায়। বারান্দা টা খুব প্রিয় জায়গা তার।
সিগারেট ধরিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। গ্রিলের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না আসছে।

পুরো শহর ঘুমোচ্ছে। কিন্তু সিয়ামের চোখে ঘুম নেই। ফোনে গান ছেড়ে সিগারেট টানছে আর আকাশের দেখছে সে।

বিথির কথা খুব মনে পড়ছে তার। পাশে বিথি থাকলে খুব জমতো। বিথির কাঁধে মাথা রেখে জ্যোৎস্না দেখত সে।

সিয়াম-বিথির প্রেম ছিল। এক বছর আগে বিথি হঠাৎ করেই যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় সিয়ামের সাথে।
এভয়েড করতে শুরু করে তাকে।

যাবার আগে সিয়ামকে তাদের ছবি গুলো মুছে ফেলার জন্য জোর করেছিল। কত শর্তই না বেধে দিয়েছিলো সিয়ামকে।
সে যেন আর যোগাযোগ না করে। তার সামনে না আসে।

সিয়াম নির্বাক হয়ে দূরে সরে আসে। সবকিছু বুঝেও সে যেন বুঝেনি।
বিথির সব বারণ মানলেও তাদের ছবি গুলো মুছে ফেলেনি।
অ্যাপ লক এ সিকিউর করে রেখেছে সে।
প্রতি রাতে বিথির ছবিতে চুমো খেয়ে ঘুমোতে যায় সিয়াম। এখন বিথির ছবি বের করে দেখছে আর সিগারেট ধোয়া উড়াচ্ছে। বিথির সাথে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে তার।
ভাবছে বিথিকে কল করবে।
কাপা কাপা হাতে বিথির ফোন নাম্বার টা স্ক্রিনে উঠালো। বিথির ফোন নাম্বার টা সে ভুলে নি।
সিন্ধান্ত নিচ্ছে কল করবে কি না। ইটস নাও অউর নেভার।
এখন সে সব বারণ ভাঙতে যাচ্ছে।
হার্টবিট বেড়ে গেছে তার। সবুজ বাটনে চাপ দিয়ে দুচোখ বুঝে কানের কাছে নিয়েছে ফোন টা।
রিং হচ্ছে। কিন্তু ফোন উঠাচ্ছে না বিথি।
কয়েকবার ফোন করেও সাড়া মেলেনি।

প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছে বিথি হয়তো ইচ্ছে করেই ফোন উঠাচ্ছে না।
ফ্ল্যাশব্যাক এ চলে গেল সিয়াম।
কত ভালোবাসতো সে বিথি কে।
স্কুলে থাকতে বিথির জন্য চকলেট কিনতো প্রায়ই। কিন্তু দেওয়ার সাহস হয়ে উঠেনি তার।
শেষমেশ ছুটির পরে সেই বসে খেতো।
চার বছর বিথির পিছনে ঘুরার পর একদিন টিফিন টাইমে বিথি যখন জানতে পারে সিয়াম তাকে ভালোবাসে।

বিথি খুব রাগ করেছিলো।

ক্লাসের সবাই কে বের করে সিয়াম কে ডেকেছিলো সে। সিয়াম ভয়ে কাঁপছিলো।
অবাক করে দিয়ে বিথি সিয়ামকে জড়িয়ে ধরেছিলো। তাদের প্রেমের শুরু হয়েছিলো সেখান থেকেই।

সিগারেট শেষ। চাঁদ টা মেঘের আড়ালে চলে গিয়েছে। এই স্মৃতি গুলো তাকে পিছু ডাক দিয়ে যায় সবসময়। সিয়ামের দুচোখ বুঝে আসছে। হঠাৎ মেঝেতে ভ্রাইব্রেট হচ্ছে। বিথি কল ব্যাক করেছে। রিসিভ করল সিয়াম। বিথি হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছে।
ফোনের ওপাশে বিথির গলা শুনে সিয়াম চুপ হয়ে পড়েছে।

হৃৎপিন্ড টা বারাবার মোচড় দিয়ে উঠছে তার। রক্ত দ্রুত পাম্পিং হচ্ছে। বিথি ফোন রেখে দিবে অমনি সিয়াম জবাব দিলো।

কেমন আছো?
-ভালো। কে আপনি ?
-সিয়াম।
বিথি একটু চুপ থেকে বলছে,

-ফোন করেছো কেনো? ফোন না করার জন্য কতবার মানা করবো?
-তোমায় খুব মনে পড়ছে। খুব একা ফিল করছি
-পৃথিবী তে আর কোন মেয়ে নেই?
-তুমিই আমার পৃথিবী বিথি।
-এসব কথা বলে দুর্বল করতে চাইছো আমায়? লাভ হবে না।
-নাহ! সত্যি বলছি।
-ফোন রেখে দিচ্ছি। আর কিছু বলবে?
-প্লিজ। রেখো না। মরে যাব আমি।
-মরে যাও। পারলে এখনি। শেষ ইচ্ছে?
-কালকে দেখা করবে? তোমায় দেখি অনেকদিন....

বিপ বিপ শব্দ হলো। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জবাব আসছে না আর। বিথি ফোন রেখে দিয়েছে। চোখ ভিজে যাচ্ছে সিয়ামের। ফোনে গান ছেড়ে শুয়ে পড়েছে।
প্রিয় মানুষের শূন্যতা অনুভব করেও তাকে সেটা বোঝাতে না পারাটা খুব কষ্টের।

ভোরের মৃদু আলো সিয়ামের মুখে এসে পড়ছে। চোখ টিপ টিপ করে উঠে বসলো ।
কাল রাতে বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো।
ফোন বন্ধ। চার্জ ফুরিয়ে এসেছে।
ফোন চার্জে লাগিয়ে হাত মুখ ধুয়ে কফি বানাচ্ছে সিয়াম।
কফি মগে চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়ছে আর রাতের মুহুর্ত গুলো ভাবছে।
কফিতে চুমুক দিয়ে ফোন হাতে নিলো সিয়াম। একটা এসএমএস এসে আছে।
বিথির নাম্বার থেকে। চোখ বড় করে পড়ছে সিয়াম।
এসএমএস এ লিখা..

"dekha korbo. park e thakba 9 tai.
ami black jama pore asbo.
ar etai kin2 sesh dekha"

এখন বাজে ৭ টা আরো দু ঘন্টা বাকি। সিয়াম কফিতে দ্রুত চুমুক দিতে লাগলো।

পার্কের বেঞ্চে বসে আছে সিয়াম। বিথির আগে এসে পড়েছে।
আজ সে বিথির সাথে অনেক কথা বলবে।
আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।
মনের অবস্থা তার আজ ফিফটি-ফিফটি।
বিথির সাথে দেখা হবে এর জন্য ফিফটি পার্সেন্ট ভালো। আর বিথি যে বলেছে দেখা করবে না আর এর জন্য ফিফটি পার্সেন্ট খারাপ।

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে পাশে তাকিয়ে সে চমকে উঠে সিয়াম। বিথি তার পাশে বসে আছে।
সিয়াম হকচকিয়ে বললো,
-কখন এসেছো তুমি?
-এক্ষুনি...

বিথি রোবটের মত বসে আছে। সিয়াম আড় চোখে বিথির দিকে তাকালো।
চেনা মুখ টা বহুদিন পরে দেখছে। সিয়াম লক্ষ্য করল বিথি উড়না টা অদ্ভুত ভাবে পড়েছে।
কেমন করে যেন পেচিয়ে রেখেছে। নতুন কোন স্টাইল মনে হয়।

সিয়াম তার জমানো কথা গুলো বলতে পারছে না। গলায় আটকে যাচ্ছে। সিয়ামও বিথির মত মাথা নিচু করে বসে আছে।

কাঁদো কাঁদো গলায় বিথি বলছে,
-বড্ড বেশি ভালোবাসো আমায়?
মুচকি হাসি দিয়েছে সিয়াম। লজ্জা পাচ্ছে।
-হ্যা, বাসিতো।
-খুব কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। নাহ?
-না তো। আমি তোমার জন্য পারফেক্ট ছিলাম না।তোমার কথামত দূরে সরে এসেছি।
-তোমার চোখ দুটো সুন্দর সিয়াম। শোন, মরে গেলে আমার কবরে একটা হাসনাহেনা ফুল গাছ লাগিয়ে দিও। হাসনাহেনা ফুলের ঘ্রাণ খুব প্রিয় আমার।

বিথি কাঁদছে। সিয়াম অস্থির হয়ে পড়েছে।
বিথি এসব বলবে সে আশা করেনি।
সিয়াম বলছে "কাঁদছো কেনো? কান্নার কিছুই তো হয়নি।"

বিথি জবাব দিচ্ছে না।
সিয়ামেরও চোখ গড়িয়ে পানি পড়ছে।
একটা হাত বিথির হাতের উপত রাখতেই চমকে উঠল সে। বিথির হাত সে অনুভব করতে পারছে না। বিথি কান্না জড়ানো মুখে মুচকি হাসি দিয়ে মিলিয়ে গেল।
সিয়াম কিছু বুঝ উঠতে পারছে না। চারপাশে তাকাচ্ছে সে। পার্কে বসে থাকা কয়েকজন তার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে।
একজন এগিয়ে এসে সিয়ামের কাধে হাত রেখে বসলেন। ভদ্রতাসূচক হাসি দিয়ে বললেন..
"ব্রাদার কোন সমস্যা? কার সাথে বক বক করছেন? কেউ ত নেই আপনার পাশে।"

সিয়াম কিছু বলছে না। আরেকজন পানির বোতল সিয়ামকে দিলেন। পানির বোতল হাতে নিয়ে নিয়ে বসে আছে।একজন ফেরিওয়ালা তাদের সামনে দাঁড়ালেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন,
"জানেন, মোড়ে ঘটনা ঘটেছে। একটা মেয়ের উড়না অটোর চাকায় পেঁচিয়ে গেছে। মনে হয় বেঁচে নেই। "
সিয়াম চমকে উঠলো
"কোন রঙের কাপড় পড়নে ছিলো? ফেরিওয়ালা কিছুক্ষণ ঠোটে কামড় দিয়ে চিন্তক মোডে দাঁড়িয়ে রইল।"
"ঠিক মনে পড়ছে না। কালো রং মনে হয় মামা।"
পানির বোতল টা সিয়ামের হাত থেকে পড়ে গেলো। উঠে দাঁড়ালো সে।
মেয়েটা বিথি নয়তো?.....

শুক্রবার বিকেল বেলা

উম্মুল খায়ের হাফছা

রোদ পরে আসলে আমি রুম থেকে বের হয়ে ছাদে আসি। সিঁড়ি ভাঙতে হয় না, কেননা ছাদের এক রুমের ওই বাসা তেই আমি থাকি। ছাদে আসার একটা বিশেষ কারণ আছে, আপনি ভাবতে পারেন আমার ছোট ছোট গাছের টব আছে যা পরিচর্যা করার জন্য বের হই, আসলে তা না। শুক্রবার বিকাল হওয়ার একটু আগে আমি এক ছিলিম গাঁজা টানি সবসময়। যদিও এক ছিলিমই না মাঝে মাঝে বেশিও। গাঁজা টানলেও আমি একদমই বিড়ি টানি না। আর গাঁজা ওই শুক্রবার বিকেলেই। কোনো বিশেষ কারণ নেই এমনিই গাঁজা টানি। মাথা টা কেমন ঝিম ঝিম করে, বেশ লাগে! অন্যদের কেমন লাগে জানি না আমার মাথা ঝিম ঝিম করে যখন গাঁজার পরিণাম বেশি হয় পৃথিবী মনে হয় হালকা দোল খাচ্ছে। গ্রামে আমাদের পাশের বাসার ওদের জাম গাছের দোলনা টার মত, মনে হয় আমি সেই দোলনা টাতেই আছি এবং হালকা করে দুলছি। গাঁজা টানার পর ছাদে হাটতে আমার ভাল লাগে। তখন পাশের বাসার ছাদেও তাকাই লুকিয়ে লুকিয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে বলছি কারণ ওই ছাদ টাতে ওই বাড়ির কোনো একটা ফ্লাটের বড় মেয়ে টাও সবসময় এই সময় ছাদে বসে থাকে। কেমন অদ্ভুত বিষন্ন হয়ে! সত্যি বলতে মেয়ে টার জন্য আমার খুব মায়া লাগে। আমার বয়সী ই হবে। পড়াশোনা করে হয়ত। ওর একটা বোন আছে। মাঝে মাঝে ওর সাথে ছাদে দেখা যায়। আপু বলে ডাকে শুনে বুঝলাম ওর ছোট বোন আর ও বড় বোন। যদিও আমি বুঝতে দেই না যে আমি মাঝে মাঝে তাকাই, ভাব ধরে থাকি দেখছি না। কিন্তু আমার ক্ষীণ সন্দেহ বড় বোনটা বুঝতে পারে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি! কেননা আপনি জানেন! ছাদে হাটার সময় কেউ একজন পিছন থেকে দেখলে যেমন অনুভূতি হয় আমার তেমন লাগে! সবসময় না মাঝে মাঝে এজন্যই আমার সন্দেহ টা। ওহ! যেটা বলতে নিয়েছিলাম বড় বোনটার জন্য আমার মায়া হয়। ভাববেন না ওকে পছন্দ করি। আসলে ওর ছোট বোন টাকেই আমার খুব ভাল লাগে। এজন্যই ওর জন্য আমার মায়া হয়। কেননা, আমার মনে হয় ও আমার জন্য ই ছাদে বসে থাকে, হয়ত আমাকে পছন্দ করে! কিন্তু আমি সবসময়ই ওর ছোট বোন টাকে স্বপ্নে দেখতে চাইতাম আর জানেন তো! প্রতিবার স্বপ্নে ওকেই দেখতাম....! না ওর ছোট বোন না মনরো!। মেরেলিন মনরোর কথা বলছি। আমার ঘরে মনরো একটা বড় ফটোফ্রেম আছে। আমি বাঁধিয়ে এনেছি। সবসময় দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি না শুধুমাত্র ঘুমের আগে আমার সিঙ্গেল খাট বরাবর টাঙাই। যাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে শুধু মনরো কে স্বপ্নে দেখি। কিন্তু কোনো বারই মনরো আসে না স্বপ্নে, অন্তত ওই বড় বোনটার ছোট বোন আসলেও হত কিন্তু না! অদ্ভুত ব্যাপার ওই বড় বোনটাই আসে প্রতিবার স্বপ্নে। জানেন স্বপ্নের স্বাদ টাই নষ্ট হয়ে যায়। তেতো লাগে। হয়ত স্বপ্নের সঙ্গী হিসেবে আমি আরও স্লীম, আরও আকর্ষনীয় কাউকে চাই। তাই স্বপ্ন ভাঙার পর কপাল কুঁচকে যায়। আগে স্বপ্নে কারা আসত মনে নেই। তখন প্রথম প্রথম অন্যরকম লাগত। যখন থেকে নিজের পছন্দ মত কাউকে চাইতে শুরু করলাম ওই বড় বোনটা আসা শুরু করল। ওহ! আপনাকে

বলা হয়নি মনরোর ফটো টা সকালেই নামিয়ে তোষকের নিচে লুকিয়ে রাখি। এখন অবধি কেউ জানে না আমার রুমে মনরোর ওমন একটা বড় ফটোফ্রেম আছে! । ছাদে এসে আমি কখনো বসি না সন্ধ্যা নামার আগ পর্যন্ত শুক্রবার বিকেল টা এভাবেই হেটে কাটাই। ছোট বোনটা উপরে আসলে সত্যি বলবো চাপা একটা উত্তেজক আনন্দ হয়। চোখাচোখি ও হয়, অদ্ভুত অনুভূতি হয় ঠিক আনন্দ কিনা বুঝি না তখন। কেননা মেয়ে টার তাকানোর মধ্যে কেমন যেনো সূচালো একটা ভাব। মনে হয় আমার টি-শার্ট ভেদ করে বুকের কাঁটা দাগ টা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে! গাঁজার নেশায় কিনা বুঝি না তবে মনে হয়, যেনো ও তাকিয়ে দাগ টা দেখবে বলেই ছোটবেলা এখানে কেঁটেছে। মতিভ্রম মনে হতে পারে আপনার কিন্তু সত্যি সত্যি আমার তখন এমনই মনে হয়। ওর ছোট বোনটা আমাকে পছন্দ করে কিনা বুঝার চেষ্টা করিনি বললে ভুল হবে। আসলে ছোট বোনটার সূচালো দৃষ্টির সামনে আমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়,বুদ্ধি কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। ছোট বোনটার সাথে গলির মাথায় বেশ কয়েক বার দেখা হয়েছে তখন কিন্তু ওকে আমার একদম অপরিচিত লেগেছে। অদ্ভুত!। বড় বোনটার জন্য এসব কারণেই আমার মায়া হয় প্রচন্ড। বেচারী কে আমি স্বপ্নেও চাই না! । বড় বোনটা হয়ত দেখতে অসুন্দর হওয়ায় নিজেও কিছু টা বিব্রত কেননা ওর সাথে চোখাচোখি হলে ওর দৃষ্টিতে সূচালো ভাব দেখি না কেমন একটা অপরাধী অপরাধী দৃষ্টি! কিন্তু বিশ্বাস করুন ওকে আমি সত্যি সত্যি ওই ভাবে চাই না। স্বার্থপরের মত শুনা গেলেও সত্যি স্বপ্নে আমি বড় বোনটার চেয়েও সুন্দর ওর ছোট বোনকেই চাই। মনরো হলে আরও ভাল!।ও বাড়ির বড় মেয়ে টাকে কি করে সরাবো স্বপ্ন থেকে আপনি জানেন? বললে বড় উপকার হত! আজকাল স্বপ্নের স্বাদ টা পাচ্ছি না। আমার স্বাস্থ্যেও তা স্পষ্ট! কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি! শুক্রবার এই সময় টা ছাড়া আমি গাঁজা টানি না এমন কি অন্য দিনগুলিতেও না। আপনিও তো শুক্রবার এই সময় ছাড়া কখনো আসেন না!!।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজন্মান্তর

ইজাজুল ইফাত

দ্বিতীয় পর্ব

১৬ই মার্চ, ১৯৭১

একটা মিটিং বসেছে। দমদার মিটিং। মিটিংটার উচ্চতা বর্তমানে এভারেস্টসম। কারণ এই মিটিংয়েই অবস্থান করছেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল বড় বড় কর্তা-ব্যক্তিরা। স্থান-কাল-পাত্র সব গোপন। বেশি উচ্চতার মিটিংগুলোর সব গোপন রেখেই করতে হয়। নাহলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তবে কিছুক্ষেত্রে উচ্চতর বিপদ নিম্নতর কারো উপকারেও আসতে পারে, কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ।

মিটিংয়ের উচ্চতাটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে মিটিংয়ের সভাপতি। যার বিরুদ্ধে এখন পূর্ব পাকিস্তানের রাস্তায় রাস্তায় স্লোগান হচ্ছে, যার চামড়ার লোভে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে হাজারো টগবগে রক্তের উদ্দাম তরুণ, ইয়াহিয়া খান। আছেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ারমার্শাল আব্দুর রহিম খান সহ আরো অনেক বড় বড় মানুষ।

আব্দুর রহিম খান এখন ইয়াহিয়ার কাছে দারুণ উত্তেজিত অবস্থায় বর্ণনা করছেন তার প্যান, কিভাবে বশ করতে হবে ঢাকাকে, কিভাবে দমিয়ে দিতে হবে পূর্বের উত্থান, কিভাবে খেলতে হবে রক্তের খেলা ।

আব্দুর রহিম খানের পাশে বসে খুব মনযোগের সাথে সব শুনছেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। কিছু একটা বলার জন্য উশখুশ করছেন, পারছেন না। মনে তার গভীর চিন্তা। আসলেই কি এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধান সম্ভব! মিটিং টেবিলের কোণায় তখন এক তরুণ এয়ার কমোডর বসে আছেন। এতো বড় বড় মানুষের মাঝে আসার জন্যএই তরুণটিকে আগে বড় মানুষ হতে হয়েছে, পূর্বপাকিস্তানের বিমানবাহিনীর অধিনায়ক। অবাঙালি হলেও তার রক্তে সাম্যতা বিদ্যমান, তিনি মানুষ বোঝেন।

আব্দুর রহিম খানের বর্ণনা শেষ হলে নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার টেনে দিলো সে। তীব্র বুদ্ধিদীপ্তচোখ আর কালো চেহারার ঝলকানিতে পরিষ্কার উর্দুতে ইয়াহিয়াকে বললো,
"আমার মনে হয় না আব্দুর রহিম খান সাহেবের প্যানে পূর্বের সমস্যার যথাযথ সমাধান সম্ভব। এটা নিছকই একটা হিংস্রতা। এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান বিমানবাহিনী থেকে সেনাবাহিনী কোনো সহযোগিতা পাবে না।"
পুরো মিটিংটি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো ওই এয়ার কমোডরের দিকে। কি বলছে এ!
এমন দুর্দান্ত বাঁধার পর মিটিং আর চালানো যায় না। ইয়াহিয়া খান মিটিং বাতিল করে দিলেন । গোপন স্থানথেকে বের হয়ে তরুণের দিকে এগিয়ে গেলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। বললেন,
"আমরা সেনারা যা বলতে পারিনি তুমি তা বলে দিয়েছো মিট্টি।"
অবাঙালি ওই এয়ার কমোডরের নাম ছিলো এম জেড মাসুদ, ডাকনাম মিট্টি মাসুদ।
যে সময়টায় মাসুদ সাহেব নিজের দূর্ভাগ্যকে কোলে টেনে নিচ্ছেন, ঠিক ওই সময়টাতেই কথা তেঁতুল খাচ্ছিলো। ওর ছয় মাসের গর্ভবতী ভাবীর সাথে। কথার ভাবী, মালা, কথার চেয়ে দুই মাসের বড়। বান্ধবীর মতো সম্পর্ক দুজনের মাঝে। কথার ভাইকে আলফাজ সাহেব গ্রামের মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন, গ্রামের মেয়েরা নাকি সহজ সরলহয়। কথার জন্যেও নাকি গ্রামে কোন ছেলে ঠিক করে রেখেছে।
কথা ও কথার ভাবীর মিল দেখে আলফাজ সাহেব মাঝেমাঝে বড় আশ্চর্য হন। দুই পৃথিবীতে বেড়ে উঠা দুটো মেয়ে কি করে নিজেদের এতো ভালোভাবে মিশিয়ে ফেলতেপারে। ওদের দেখে তো তেল আর পানির লজ্জা পাওয়া উচিত, তরল পদার্থ হয়েও দুটো মিশ খায় না।
তেঁতুল খেতে খেতে কথা মালাকে উদ্দেশ্য করে বললো,
-ভাবী, তোমাকে একটা কথা বলি?
"হুম, বল" জবাব দিলো মালা।

"আচ্ছা, ভাইয়া যে এতো দূরে, সেই ইংল্যান্ডে গিয়ে পড়ছে, তোমার কষ্ট লাগে না?"
"আমার কষ্ট কি তোকে মুখে বলতে পারব রে বোকা! তোর প্রেমিককে ছেড়ে থাকতে তোর যেমন লাগবেআমার তার চেয়েও হাজার গুণ কষ্ট।"
মালার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে কথা বলে উঠলো,
"ধ্যাত, কি যে বলো না ভাবী।"
"একটা গান ধরতো কথা" বললো মালা
"কি গান? এইসব অসময়ে তুমি যে কি কি আবদার করনা!"
"আমি আবার কখন আবদার করলাম, আবদার তো করলো তোর ভাতিজি। আমাকে পেট থেকে বলে দিয়েছে।"
"বুঝলে কিভাবে ভাতিজি, ভাতিজাও তো হতে পারে।"
"আমি কিছু কিছু জিনিস আগে থেকে টের পাই রে! বেশিকথা বাড়াস নে। ধরতো একটা গান। এই যে আবার তোর ভাতিজি লাথানো শুরু করেছে তাড়াতাড়ি গান ধর।"

কথা কিন্নর কণ্ঠে গান ধরলো, যেই কিন্নর কণ্ঠটা আবেদকে তার কাছে টেনে নিয়ে এসেছে,

"ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা.....
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

গানটা শুনতে শুনতে মালার মাথাটাও হাজার স্মৃতি দিয়েভরে উঠলো।ওদিকে মেয়েটা(!) সমানে লাথিয়েই যাচ্ছে পেটের ভেতর। বের হলে না জানি কি করবে!

১৭ই মার্চ, ১৯৭১

নেতা সকাল সকালই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়াটা ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস।আযানের সাথে সাথেই বিছানা ছাড়লেন তিনি। কঠোর পদব্রজে হাঁটছেন। মাটি হালকা কাঁপছে। মাটিটা কি তাঁর পায়ের চাপে কাঁপছে নাকি তাঁর দৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে!
ওযু করে নামাজ পড়তে বসলেন তিনি। ফযরের সুন্নতের দ্বিতীয় বৈঠকে বসেছেন কেবল। পুরো অন্ধকার ঘর। মাথার উপরে একটা ফ্যান শব্দ করে ঘুরছে। হঠাৎ হঠাৎ কিচ কিচ শব্দ হচ্ছে ফ্যান থেকে এই নিশ্চুপ ঘরে। ফ্যানের বাতাসে জানালা আগলে রাখা একটা পর্দা দুলছে। সালাম ফিরিয়ে নেতার পুরো মনযোগ টেনে নিয়েছে ঐ পর্দার দুলুনি। সুন্দর একটা ছন্দ তৈরি করে ওটা দুলছে। পর্দার তৈরি করা মায়া ছন্দে ডুবে গেলেন নেতা। এমন সময় বাইরে থেকে স্লোগান ভেসে এলো,

"আমার নেতা, তোমার নেতা,
শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।"

পিন্ডি না ঢাকা
ঢাকা ঢাকা।"

খানিক বিরক্তই হলেন নেতা। এটা কোন মিছিল আনার সময়! যদিও দেশে এখন সময়-অসময় বলে কিছু নেই। পুরো দেশটাই চলছে আগুনের উপর। আগুনের তাপে সময় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।আগুন আর সময় দুটোই চতুর্থ মাত্রার বস্তু। প্রবল অন্ধকারে কোনো মাত্রার বালাই থাকে না। দেশের তো অন্ধকার সময়ই এখন ।
বাইরে স্লোগান থেমে গেছে। পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে হালকা কথাবার্তা।
"বোধহয় পুলিশের গোয়েন্দাগুলো কিছু বলেছে। গলার জোর শুনে তো মনে হচ্ছিলো শ্রমিক লীগ , এতো সহজে থেমে গেলো" ভাবলেন তিনি ।
হঠাৎ, শোবার ঘর থেকে উঠে এলেন তাঁর সহধর্মিণী। মায়াভরা নয়নে নেতার দিকে তাকিয়ে বললেন,
"শুভ জন্মদিন।"

"ওহ আজ তো জন্মদিন। তাই বোধহয় এতো সকালে মিছিল নিয়ে এসেছে" নিশ্চুপ থেকেই আবার ভাবলেন তিনি।

দরজা খুলে বাইরে এলেন নেতা। বজ্রকণ্ঠ শুনে সবাই বিমুগ্ধ নয়নে তাকালেন পাঞ্জাবী পরা নেতার দিকে।

"এই তোরা এতো সকালে এসেছিস, নাশতা করে যাস।"

সকাল থেকেই আবেদের মনটা উশখুশ করছে। না, কথারজন্য না। তার মনে এখন কথার চেয়ে দেশের জায়গাটা বেশি। আবেদ কথার প্রতি তার ভালোবাসার সাথে ভয়ের খানিক মিল খুঁজে পায়। ভালোবাসা আর ভয় এই দুটোই জ্ঞাতি ভাই বলা যায়। দুটোই যেমন হুট করে আসে তেমনি হুট করেই বিদায় নেয়। এজন্যই আবেদ কিছুদিন ভালোবাসা থেকে দূরে থাকতে চাইছে, আরো হাজারটা সংগ্রামী যুবকের মতো। তার মনে ভেসে উঠে স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমোঘ বাণী

"বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভয় চলিয়া যাইবে। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বদ্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে।"

কয়েকদিন ধরেই শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা চলছে ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর। লাভের লাভ শূণ্য। এভাবে চলতে থাকলে পরিণতিটা ভালো হবে না। নেতাদের তো কিছু হবেনা। যা হবে তার মত ছাত্রদের। হলের নিজের ঘরটার বাইরে একটু উত্তেজনা দেখে বাইরে এলো আবেদ। ছাত্রনেতা ওমর মিছিল নিয়ে এসেছে। চোখে চোখ পড়তেই ইশারায় ডাক দিলো আবেদকে। আবেদ কবিতা পড়ছিলো, একপাতা কবিতা কালরাতে ওকে এনেদিয়েছে ওর রুমমেট করিম । নাম নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়। কোনো কবির নাম নেই ।

কবিতায় লিখা আছে,

শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে,
অবশ্য আসতে হয় মাঝে মধ্যে
অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে।

অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানেই বোধহয় কবিতার পাতাটা বইয়ের ভাঁজে রেখে নিচে নেমে গেলো শাশ্বত শান্তির আবেদ। আজ মিছিলে যুদ্ধ হবে, রক্তাক্ত রক্তপাতহীন যুদ্ধ। কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা হবে ইয়াহিয়ার টুটি, অদৃশ্য ইয়াহিয়া।

আজই কিছু একটা হয়ে যাবে। রোজই তো মনে হয় তাই ।

১৯শে মার্চ, ১৯৭১

জয়দেবপুর এসেছে ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আরবাবের নেতৃত্বে এক ব্যাটালিয়ন পাকিস্তানি সেনা, ৫৭ ব্রিগেডের। তার কাছে উড়ো খবর আছে, ২ ইস্টবেঙ্গল নাকি বিদ্রোহ করেছে।(১)
সাহস কত, খাওয়াচ্ছে পশ্চিম, পরাচ্ছে পশ্চিম আর তোরা পূর্ব স্বাধীনের জন্য বিদ্রোহ করিস। মনে মনে ভাবলেন ব্রিগেডিয়ার আরবাব।
"সব ব্যাটার অস্ত্র নিয়ে নিতে হবে। তারপর ডিরেক্ট কোর্ট মার্শাল।" বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

২ ইস্টবেঙ্গলে পৌঁছেই একটা দুঃসংবাদ পান ব্রিগেডিয়ার আরবাব। ঢাকা-জয়দেবপুর মহাসড়ক নাকি পাবলিক ব্যারিকেড দিয়ে আটকে রেখেছে।আর্মির রেশনের ট্রাক নাকি হাইজ্যাক করেছে। এ যে বড্ড যন্ত্রণা।

"রাবিশ বেঙ্গল পিপল" বিড়বিড় করে বললেন তিনি।
মেজর মঈনুল হোসেন নামক এক বাঙালির নেতৃত্বে ২ইস্টবেঙ্গল থেকে কাউন্টার টিম পাঠালেন দ্রুত। নির্দেশ দিলেন,

"Open Fire "

মেজর মঈনুল হোসেন পড়ে গেলেন বড্ড দোটানায়। এযে ভাই হত্যার আদেশ। তখন পুরো দেশ যেন আত্মার আত্মীয়, পুরো দেশ যেন ভাই। একজন বাঙালি মেজর হয়ে তিনি কি করে পারেন আরেক বাঙালী মারতে? সেনাদের নির্দেশ দিলেন,
"গুলি চালাও, কিন্তু এমনভাবে চালাও যেন মানুষের মাথার উপর দিয়ে যায়।"
এ কথা আবার কানে পৌছে গেলো আরবাবের।
পরবর্তী বার্তা আসলো,

"Shoot to 'kill' "

প্রমাদ গুণেন মঈনুল হোসেন। এখন যে তাকে গুলি করতেই হবে। পরে বাধ্য হয়ে চালালেন ৬৩ রাউন্ডগুলি। অবাঙালি এক সেনার গুলিতে মারা গেলেন দুইজন।
বড্ড শান্তিতেই ব্যারিকেড লাগাচ্ছিলো ওরা, হঠাৎ কি থেকে কি হলো!
এই ঘটনায় নিজের পরিষ্কার অবস্থান তুলে ধরতে চরম ফল দিতে হয় ২ ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হককে। তাকে পশ্চিমে বদলি করে পূর্বে নিয়ে আসা হয় ৩২ পাঞ্জাবের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল রাকিবউদ্দীনকে, নিজ দেশের সাথে বেঈমানী করে যে পশ্চিমাদের আদরে আদরে ছিলো।(২)

১৯ তারিখ সকাল থেকে কথাদের বাসার সামনে ঘুরঘুর করছিলো আবেদ। বাসার সামনের রাস্তায় তিন-চারবার চক্কর দেয়। দিয়ে মোড়ের চায়ের দোকান থেকে এক কাপ চা খায়।
এখন আর বাসার সামনের রাস্তায় যাচ্ছে না। পার্মানেন্টলি চায়ের দোকানে বসে আছে। শেষবার যখন গিয়েছিলো দেখেছিলো, কথার বাবা বারান্দায় বসে তার দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছিলো। কোন কিছু সন্দেহ করবে এই ভয়ে সে আর যায় নি এমনটা না।সন্দেহ করলে তার কিছু যায় আসে না। সে চায়ের দোকানে বসে বসে এখন রেডিও শুনছে। হলে টিভি আছে, রেডিওও আছে। দুইটার সামনেই

ছোটখাটো মিছিল থাকে। আরাম করে কিছু শোনা যায়না।
"জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর সাথে সাধারণ মানুষের সংঘর্ষে দুইজন নিহত"
এ খবর দোকানদার বলে উঠলো,
"দেখছেন ভাই, দেখছেন, বাঙালি সেনাগুলানও বিগড়ায়া গেছে। হালা ভোম্বলগুলা।"
আবেদ চুপ করে আছে। কিছু একটা আছে কাহিনী ভিতরে ভিতরে!

হঠাৎ পাশ দিয়ে কথার বাবাকে হেঁটে যেতে দেখলো,একটা ছাতা বগলে নিয়ে বাজারের ব্যাগ হাতে কোথায় জানি যাচ্ছে। আবেদ উঠে পড়লো। না, কথার বাসায় না, এখন সে হলে যাবে। দেখবে কোন মিছিল মিটিং আছে কিনা। ইদানীং দেশটা যেন কড়াই হয়ে আছে। উত্তপ্ত খাঁটি লোহার কড়াই। কড়াইয়ের কোন এক জায়গায় এক ফোঁটা পানি দিলে যেমন ওই এক ফোঁটা পানি পুরো কড়াইয়ে পাগলের মত ছোটাছুটি করে,ছাত্ররাও যেন এক ফোঁটা পানির মত জঙ্গি মিছিলে ছুটছে। তোফায়েল আহমেদ, আ.স.ম. আব্দুর রব,ওমর শরীফ,নাজিম কামরান এক এক জন ভিন্ন মতাদর্শের নেতা যেন মিলেমিশে একাকার। এনএসএফের কতগুলো গুন্ডাও যেন হঠাৎ করে স্বাধীনতার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ৭ই মার্চে আব্দুর রব তো বলেই দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা না দিলে ছাত্রসগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হবে। এরকম নানা ধরণের কথা ভাবতে ভাবতে হলের দিকে এগিয়ে চলে আবেদ, নাহ মেডিকেল হলে যাবে না সে,জহুরুল হলে যাবে, দেখা যাক কি হয়।

কবিতা

আমি নির্বাসনে যেতে চাই

নাঈম আরিয়ান

আমি নির্বাসনে যেতে চাই।
তোমাদের এই ধূলিমাখা, দালান কোঠার
অন্ধকার গহবরে বেঁচে থাকা
আমার পোষাবে না।
আমি নির্বাসনে চলে যেতে চাই।

এই নাগরিক জীবন আমাকে টানে না।
দিনরাত একাকার হয়ে যাওয়া
এই দুঃস্বপ্নের প্রহর গুলো থেকে
আমি মুক্তি পেতে চাই।
আমি নির্বাসন চাই।

হে আমার শুভাকাঙ্খীরা, আমায় নির্বাসন দাও।
আমায় তাড়িয়ে দাও।

তোমাদের এই নির্লিপ্ত মোহ, বিভ্রম থেকে
বিদায় নিয়ে আমার নির্বাসনকালে
কিছু সীমিত সুখের বীজ চাষাবাদ করতে চাই।
আজন্ম বেদনা বিলাস আমার আর বুকে সইছে না।
আমি দূরে সরে যেতে চাই।
এক নির্জন দূর দ্বীপে আমি আমার বাসস্থান চাই।

বুক পকেটে জমানো প্রিয়ার কিছু হাসির ফোয়ারা,
কয়েক ফোঁটা সুনীল অশ্রু, এক ছটাক অভিমান,
ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ, মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি
নিয়ে আমি নির্বাসনে যেতে চাই।

তোমাদের নিরর্থক কিছু সান্ত্বনার বাণী,
আর চোখভরা কিছু মিথ্যে অশ্রুজল দেখে
আমি চলে যেতে চাই।

আমার একান্ত জীবনে মানুষের ছায়াও যেন না পরে।
এক সবুজ ছায়াঘেরা দ্বীপে
তরুলতার ভীড়ে এক নির্জন কুটির বানিয়ে,
বন্য পাখিদের বিচিত্র মায়ামুগ্ধ ডাক শুনে,
অথৈ সাগর জলের তুমুল গর্জন শুনে শুনে,
আমি আমার বাকী মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দিতে চাই।
আমি শিশিরের জল গায়ে মেখে,
বৃষ্টির শীতল পরশ গায়ে মেখে,
আমাকে উপভোগ করতে চাই।
আমি আমাকে শূণ্যে মিশিয়ে দিতে চাই,
আমি আমাকে তলিয়ে দিতে চাই।
তাইতো আমি নির্বাসন চাই।

আমি আমার জন্য নির্বাসনে যাবো,
আমি কবিতার জন্য নির্বাসনে যাবো।
নক্ষত্রে ঘেরা রাতের আকাশ হবে আমার সঙ্গী,
পূর্ণিমার রাতে জ্বলন্ত চাঁদের আলোর নিচে
কবিতার সাথে হবে আমার বাসর,
আর সেখানে জন্ম হবে আরো শত শত-সহস্র কবিতা।
তাইতো আমি নির্বাসন চাই।
আমায় নির্বাসন দাও।

শিক্ষার্থী: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমার ষড়ঋতু

মোঃ সামিউল হক

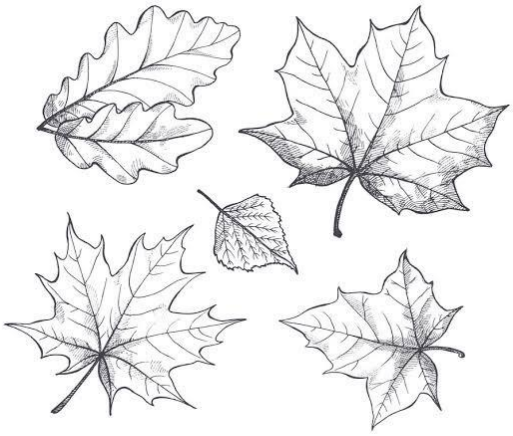

শীতের ভোর,
শিশির পড়ছে,
গাছের পাতার ওপর,
ফুলের পাপড়ির ওপর,
আর সে শব্দ আমি শুনছি ।

বসন্তের বিকেল,
সুন্দর একটা পার্কে হাঁটছি,
তোমার হাতটা ধরে,
উপরে তাকিয়ে, দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণচূড়ার দোলা,
আর আকাশের রং।

গ্রীষ্মের দুপুর,
উত্তপ্ত রাস্তা,
সুখ নেই হেঁটে,
তবুও হেঁটে যাচ্ছি,
কেন?
তা তো জানি না ।

বর্ষার রাত,
অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে,
কল্পনা করছি,
আমার বাসার ছাদটা টিনের,
আর তাতে বৃষ্টি পড়ার ঝমঝম শব্দ হচ্ছে,
যেমনটা শুনতে পেতাম ছেলেবেলায় গ্রামের বাড়িতে ।

শরতের সকাল,
আকাশটা ভর্তি,
শুভ্র মেঘে,
দেখতে দেখতে ভাবি,
বাসার পাশের মাঠটা কাশবনে ভর্তি,
আর তাতে আমি ছুটছি।

হেমন্তের সন্ধ্যা,
হালকা কুয়াশায় চারপাশটা ঢাকা,
তার মধ্যে যেন জ্বলছে জোনাকি,
মনে হলো ধানের গন্ধ পাচ্ছি,
সেই সাথে হাঁটছি আর,
ভাবছি জীবনটা কত সুন্দর ।

Institution: SOS Hermann Gmeiner College

প্রণয়ের অভিন্ন গঙ্গা

নয়ন চন্দ্র শীল

প্রণয়ের অভিন্ন গঙ্গায়
কেন তুমি ফারাক্কা বাঁধ দিলে; কি প্রচ্ছন্ন প্রাপ্তি নিহিত সেঁথা?
প্রয়োজনাধিক প্রণয় তো কামনা করিনি, স্বার্থ সংরক্ষণের
দাবীও করতাম না কদাচিৎ।
আমার হৃদয়ভূমি জলরূপ প্রেমশূন্য হয়ে যেতো; বিশুষ্ক সে হৃদয়জুড়ে
প্রকটিত হতো চৌচির ফাটলের নকশা।
যে নকশার ছবি তুলে কোনো বিদেশি
রাতারাতি পেয়ে যেতো শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীর তকমা,
জিতে নিতো পুলিৎজার পুরস্কার।
অনতিবিলম্বে এই হৃদয়খরার সন্দেশ পৌঁছাতো নিখিল ভুবনে।
জানি, এ খবর তোমার কর্ণ গুহরে বিদ্ধ হতো না কভু।
প্রণয়বন্যায় যখন তোমার অস্তিত্ব বিলীনের মুখাপেক্ষী
সেই সময়; ঠিক সেই সময় খুলে দিতে জলদ্বার যাতে
অথৈ প্রেমজলে হাবুডুবু খেতে খেতে আধমরা অথবা
মরে যাই না কেন সেদিকে তোমার ভ্রুক্ষেপ ছিল না আদৌ।
কখনো-সখনো প্রেমবারি বন্টনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হতো আমাদের মাঝে;
তবে মানতে না সেসব, একাধিপত্য সৃষ্টি করতে নিজের অনুকূলে
যাচ্ছেতাই অবস্থা বিরাজমান যুগ যুগ ধরে বিশ্ব তা দেখতো আনমনে।
ভুলে যেয়ো না প্রকৃতির প্রণয় প্রবাহকে বাঁধা দেবার কেউ নই আমরা;
একদিন প্রকৃতিও হবে বিরূপ, দেখাবে তাঁর বিপরীত প্রতিক্রিয়া
সামলাতে পারবে না তা সেদিন,
ততোদিনে আমিও হয়ে যাব ঠুঁটোজগন্নাথ।

শিক্ষার্থী: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে

অনির্বাণ দেবনাথ

মাঝে মাঝে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে নদীর কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে পাগলামির কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে শিউলি আর মাধবীলতার কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে আজন্ম অপেক্ষার কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে চোখের জলের কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে উন্মত্ত কবির কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে এবড়ো-থেবড়ো ধুলোয় ভরা জীবনের কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে এক একটা নির্ঘুম রাতের কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে জোছনার কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে পাপ-পূণ্যের কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে কপটতার কাছে ,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে সরষে ক্ষেতের কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে এই শহরের ইট, কাঠ, মাটি, পাথুরে কষ্টের কাছে,
ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে সরল হৃদয়ের কাছে।

দিনকে দিন এইভাবে নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষণিক ঘৃণার দীর্ঘ ব্যবহারে বিবেকের আলাপন মিশে যায়
শোকের তাড়নায় প্রবাহমান ব্রহ্মপুত্রের জলে ভেসে যায় রক্তজবার বীজ ;
আমি আবছায়া নগরীর রাস্তাঘাটে চাপা আক্ষেপের ক্ষুধা দেখি।
দিনের পর দিন আমাকে ছিড়েখুঁড়ে খায় চিল, শকুন,
তবু আজো আমার ক্ষমা মিলে না।
দিন চলে যায়—
ক্ষমা মিলে না, ক্ষমা মিলে না।

শিক্ষার্থী: ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

শেষ দেখা

তাসমী

সেদিন ছিলো অরুর সাথে আমার শেষ দেখা।
অরুর হাতে ছিলো গুটিকয়েক বই,
আমার উপহারের বই আমায়-ই ফিরিয়ে দিলো অরু।
বলেছিলাম, “বই ফিরিয়ে দিলে দাও,
বইয়ের গল্পে যে আমি আর তুমি ছিলাম, ফেরাতে পারবে?”

অরু সেদিন নিঃশ্চুপ ছিলো বোবা পাখির মতো।
তাঁর চোখেও আমাদের গল্প ভাসছিলো, চোখের জলের স্রোতে আমাদের বইগুলি ভিজে গেল।
আমি ভেজা বইয়ে তাঁর শূণ্যতার গল্প জুড়ে দিলাম।
তারপর থেকে আমি আছি সেই বইগুলি নিয়ে,
এখন আমি প্রতিদিন একই বই বারবার পড়ি,
আর আমাদের গল্পেই আমাদের খুঁজি।

শিক্ষার্থী: খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আমি চাই তুমি ভালোবাসো

মশিউল আলম অন্তু

বড় অবেলায় তোমার আগমন,
বড্ড দেরি করে ফেললে।
রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে?
তবে কেন এতো দেরি?

ততদিনে চৈত্রের প্রখর রোদে পুড়ে আমি হয়েছি শুকিয়ে যাওয়া এক বিশাল মরুভূমি।
এখানে কোনো সবুজ নেই,
নেই কোনো তরতাজা প্রাণ।

তোমার আগমনে প্রেম জেগেছে আমার শরীরে,
কচুরিপানা কি মরুভূমিতে বাঁচতে পারে?
তোমাকে ধরে রাখার তরে
শীতল পানি জমিয়ে রাখি মরুভূমির পরে।

স্বচ্ছতা আর ভালবাসা লুকিয়ে রেখেছি
শীতল জলের গভীরে,
আমি চাই তুমি ভালবাসো
মিশে থাকো আমার শরীরে।

শিক্ষার্থী: ঢাকা কলেজ

অশীতিপর

তানজিমুল ইসলাম

দিপু, ও দিপু!
এ দিকে একটু আয় তো বাপু।
জ্বী আসছি, দাদা।
এ কি তোমার পায়ে কেন কাদা?

ঈষৎ হেঁসে বললেন দাদা, 'মাটিতে মাটি লেগেছে;
পুকুড়পাড়ে গিয়েছিলাম-অনেক লেবু হয়েছে।'
বুড়ো হয়েছ তুমি অশীতিপর,
তবে এখনো চারিদিকে এতো কেন নজর?

এ গাছটা তোর দাদীর নিজে লাগানো,
মনে হয় এখনো লেগে আছে তার হাতের চিহ্ন।

আচ্ছা এবার দাদীর কথা বলো দেখি,
তুমি বলো আমি তার ছবি আঁকি।
"তোর দাদী?
খুব আদর করে ওরে ডাকতাম আহ্লাদী।
একদিন সন্ধ্যা পরে বাবা আসলেন ঘরে,
বললেন, ওরে ভবঘুরে এবার সম্বন্ধ এক করে এসেছি পাকা,
আজ বাদে পরশু শুক্রবার পাবি তার দেখা।
জীবন যুদ্ধে যৌবন সেনাপতি,
আর আহ্লাদী ছিল আমার সুখের সারথি।
জানিস অনেক সুন্দর ছিল তার মুখ!
মায়ায় লেপ্টে ছিল তার দুচোখ!
বলে কি আর তাশেষ করা যায়?
চোখের জলে বুঝানো বড় দায়!"

আচ্ছা দাদা তারপর বলো,
কখন কিভাবে কি হয়ে গেল?

"তোর দাদী আসলো আমার ঘরে,
আলোয় যেন পুরো ঘর গিয়েছিল ভরে!

পিতার দেওয়া কিছুই ছিল না আমার, শুধু ছিল ভিটে;
ভবঘুরে আমি দিন এনে দিন খাই সারাদিন খেঁটে!
কোন অভিযোগ ছিল না তার,
একটা নীল শাড়ি শুধু করেছিল আবদার।

একদিন তার হাত পুঁড়ে গেল,
ক্ষেতে কাজ করছি; কলিম মিয়া খবর নিয়ে গেল
শুনেই ছুটে এলাম বাড়ি,

যেন কিছুই হয় নি; আমার সাথে করছে লুকোচুরি!
এজন্য খুব অভিমান ছিল তার উপর,
দানাহীন ছিলাম টানা চার প্রহর।

এক সন্ধ্যায় এসে বললো কানে কানে,
পিতা হতে চলেছে সে কি জানে
শুনিয়া, আমি তো বিস্মিত, কিংকর্তব্যবিমুঢ়!
কানের কাছে যেন কেউ গাহিল সুমধুর সুর!
এমন সুর শুনিনি তো আগে ,
আবেগে জড়িয়ে নিলাম তারে পরম সুখে।

এরপরে মাস কিছু দিন বাকি,
খুব চিন্তায় আমি কি করি কোথায় তারে রাখি?
তারে করতে দিতাম না কোন কাজ,
বেলা শেষে দ্রুত বাড়ি ফিরতাম যেন না হয় সাঁঝ।
নিজে রান্না করে খাওয়াতাম মুখে তোলে,
জানতাম কি এতো মায়ায় বেঁধে একা করে যাবে চলে?

শুক্রবার বিকেল শেষে প্রসব ব্যথা হলো শুরু,
পাশের বাড়ির চাচীকে ডেকে আনলাম, সাথে এলো নীরু
এশারের সময় হয়েছে তখন হঠাৎ নব শিশুর কান্না!
সাথে সাথে আযান দিলাম, আল্লাহু আকবর.....লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
নীরু এসে বললো ভয় হচ্ছে খুব ভাবিকে দেখে,
কি যেন বলবে তোমায় ভেতরে ডাকে।
ভেতরে গিয়ে দেখি মায়াবী চোখ দুটোতে অশ্রুস্নান!

দুপুরেও দেখা সোনা মুখখানা তখন কালোয় ম্লান
গিয়ে বসেছি তার পাশে,
ঠিক দেখতে পায় না; বলতে গেলে কষ্ট পায় সে,
ছেলেকে কোলে দিয়ে বলেছিল এই নাও সোনা মানিক দিয়েছি তোমায়,
অনেক কষ্ট দিয়েছি-ক্ষমা করো; ভুলে যেয়ো আমায়।
শেষবেলায় আর পারিনি দেখিতে তার হাসি,
নির্বাক আমি বলতে পারিনি, ওগো তোমায় অনেকখানি ভালোবাসি!

এনে দিবো, এনে দিবো বলে নীল শাড়ি এনে দিতে পারি নি হায়!
লাল শাড়িতে এনেছিলাম এক শুক্রবারে এনেছিলাম ঘরে,
সাদা কাপড়ে সেই শুক্রবারে তারে দিয়েছিলাম বিদায়।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার বীজপত্র

রেবেকা তাসমি

শত বছর আগে ভালোবাসায় জন্মেছিলো
প্রিয় দেশের স্বাধীনতার বীজপত্র,
কতজন কতভাবে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলো
স্বাধীনতা, চেয়েছিলো কতশত কূটনৈতিক পত্র।

সেদিন থেকে শুরু এই লড়াইয়ের, সংগ্রামের,
সেদিন থেকে স্বপ্নগুলো দানা বাঁধতে শুরু করেছে,
কতজন এলো গেলো, মুক্তির ঝঙ্কার নিয়ে,
কেউবা জোয়ার তুলেছে, কেউবা হেরেছে।

এমনি করে সাতচল্লিশ এলো,
ধর্মতত্ত্বে দুটো ভাগ বিভক্ত হলো।
তবু কেউ বললোনা ভাষার কথা,
তারা বরং একটি ভাষার জনপদকে বিভক্ত করে,
নিজেদের সবকিছু গুছিয়ে চলে গেলো।

তারপর এলো বায়ান্ন,
ভাষার দাবিতে সোচ্চার ধ্বনি,
শাণিত করলো মুক্ত কণ্ঠের তরবারি।
বুকের তাজা রক্ত বিছিয়ে দিলো,
ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-জনতা,
তবুও চাই প্রাণের ভাষা, প্রাণের জন্মভূমি।

জনতার কণ্ঠে প্রাণের ধ্বনি,
ভাষা চাই, দেশ চাই।
চাই নিজেদের বাক-স্বাধীনতা,
আর কখনো হতে চাইনা কারো দয়া গ্রহীতা।

শেরে-বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাষানী এলেন,
ধীরেন্দ্রনাথ সংসদে প্রথম ভাষার কথা বলে গেলেন।

তারপর এলেন সেই মহান নেতা,
রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তবু পাশে আগলে রাখলেন।

শেখ মুজিব, মুক্তির নাম, স্বাধীনতার নাম,
হাজার নেতা জানায় সালাম।
তারই হাত ধরে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত,
বহুল প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা, বাংলাদেশ নাম।

ত্রিশ লক্ষ শহীদ, কত হাজার, লক্ষ মুক্তিসেনা,
লড়াই করেছিলো, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে,
বুকে চেপে রেখেছিলো একটি নাম,
সে আমার বাংলাদেশ।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয়তমা এসরাজ

হাফিজুর রহমান

আদিম ঘুনে ধরা জরা যন্ত্রের মতো বাজছে জীবন
আগন্তুক খসে পড়া স্বপ্ন নক্ষত্রগুলোও বাজছে
ভেতরের অর্গান থেকে সযত্নে বেজে বেজে উঠছে নিঃশ্বাস যন্ত্র
হৃদয় উনুন থেকে ছড়িয়ে পড়ছে
জীবনের ঝরাদিনগুলির জীর্ণ শীর্ণ অনুতাপ।
শেষবেলার জীবন সংগীতে মেতে উঠেছে
এক আলোক বর্ষ শোকে তপ্ত আমার সমস্ত শরীর,
এবার শেষ মিনতি শোনাবার পালা
বিদায় বেদনার গীত গাওয়ার পালা,
তবুও প্রস্তুত সমাবেশে
আমার একটি আদিম অপেক্ষা ফুরোয়নি
আমার পঞ্চেন্দ্রিয় এখনো একটি যন্ত্রের জন্য অপেক্ষারত,
যে যন্ত্র এতোটাকাল আমাকে
বেদনাকে বেদনা দিতে শিখিয়েছে
দুঃখের মুখে দুঃখ ছুঁড়তে শিখিয়েছে,
যে যন্ত্র শুনলে আমি মৃত্যুকেও হেসে উড়াতে পারি!
বেলা শেষে অন্ধকারে ডুব দেয়া গোধূলির মতো
অথবা পরাজিত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো

ডুবে যেতে পারি মৃত্যুর চেয়ে আরো বেশি অতঁলে
যেখানটা মৃত্যুও কখনো স্পর্শ করেনা
রাগ ভৈরবী বাজা আমার সেই

প্রিয়তমা এসরাজ।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষাদের কালবেলা

রাতুল

ইতিহাসের দীর্ঘ অ্যালবামের গায়ে লেপ্টে আছে
বিষাদের দিনরাত্রি,
বারুদের গন্ধ, রক্ত ভেজা মাটি,
মৃতদেহ দেখা অভ্যস্ত লাল চোখ।

দেশে-বিদেশে অভাবের অবহেলিত ম্লান চেহারা,
সময়ের পাশবিক অত্যাচারে জখম
আমাদের শরীর।

ইতিহাস থেকে আমি, তুমি আর আমরা
বর্তমানেও একই বাতাসের গন্ধ পাই।
এই সময় খুঁড়ে কেবলই
নীরবতার আর্তনাদ শুনে যাই।
বেদনার নক্ষত্রভরা রাতে শরীর এলিয়ে দিয়ে
মৃত নক্ষত্রের লোকালয়ে এসে পড়ি,
মৃত নক্ষত্রের আসমান ভরা অপূর্ণতার গল্প,
জয়-পরাজয়ে কত বিরহ গাঁথা সেই আসমান।

পথে আজো শত-শত পথিক,
সেই একই নিরুদ্দেশ যাত্রা,
রাজপথে যুগ যুগ ধরে একই প্যাকার্ড,
পৃথিবীর শুরু থেকে এই প্যাকার্ডের জন্ম,
একই আওয়াজে মিছিল, ধর্মঘট,
হেঁটে চলা সমাবেশ,
সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে।

মানুষের সোনালি চোখের মৃত্যু,
হাসির মৃত্যু, হেঁটে চলা পথের মৃত্যু,
এই বিষাদের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে,
সহজ মৃত্যুর সন্ধানে নেমে,
বহু মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি আমি।

পাকস্থলিতে উইপোকার বসবাস,
অনুভূতিতে ঘুনপোকার আক্রমণে
ভিতরে বাহিরে প্রতিনিয়ত

প্যাঁচার অশুভ ডাক শুনে যাই।
সময়ের আড়ালে সময় পেরিয়েও
একই সময়ের নীচে বারবার
আমি, তুমি আর আমাদের সভ্যতা।
এখনো শীতল চোখে মৃত স্বপ্নরা জেগে,
রক্তমাখা দেহ এখনো বিষন্নতার চাদরে মোড়ানো,
ক্লান্তমুখে এখনো পুরনো ক্ষুধার ছাপ,
এই পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার,
সময়ের আড়ালে সেই সময়ই,
ছুটে চলে অবিরাম।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বপ্নভ্রম

আহমেদ সুমন

একটি ঘুড়ির মতো আমিও উড়ি
স্বপ্নের আকাশে,
নিমিষেই ঘুরে বেড়াই
পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে
মিশরের পিরামিড আর নীলনদ
যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পাই।

চিলের মতো আমিও উড়ি
একটি শিকারের খোঁজে,
বকের মতো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
একমুঠো অন্নের আঁশে
স্বপ্নের ঘরে আমি চরে বেড়াই
হ্যামিলনের সেই ইঁদুরের রাজ্যে
বাঁশির সেই মোহনীয় সুরে
আমি হারিয়ে যাই যুগ থেকে যুগান্তরে।

দিনের দিগন্ত শেষে, ভেঙে চুরমার হয়
মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান ঘুড়ির সব স্বপ্ন।
আবার ফিরে আসে বালকের নাটাই
আবার ফিরে আসে আপন ঠিকানায়।

স্বপ্নে ভাসতে ভাসতে ক্লান্ত আমি
হঠাৎ চোখ মেলে দেখি;
আলোমাখা চাঁদ আমার পানে তাকিয়ে
মুচকি হাসিতে নিমজ্জিত
বুঝলাম সবি স্বপ্নের খেল
সবি মিছে মায়ার জাল
স্বপ্ন ও বাস্তবতা, পৃথিবীর দুই মেরু।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সভ্যতার কুলখানি

বিশাল সাহা

আমি মরে যেতে চাই, কোনো কারণ ছাড়াই
আমি মরে যেতে চাই।

ঘন কুয়াশায় মরে যেতে চাই
শিউলীর ঘ্রাণে মিশে যেতে চাই
আঁধারের কৃষ্ণগহ্বরে নিজের প্রতিবিম্ব এঁকে যেতে চাই।
আমি অনিয়মের কাঁথায় নিয়মের সুঁচ গেঁথে মরে যেতে চাই।
আমি মরে যেতে চাই, মিশে যেতে চাই
বিকেলের রোদে ছায়া হতে চাই।
মাটি ভেজা রঙের পাখি হতে চাই, কারণ ছাড়াই স্মৃতি হতে চাই।
সবার আড়ালে, মায়ার খেয়ালে আমি চলে যেতে চাই।

আমি চাই আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাক,
জীবন থেকে জীবনের মতো বয়স মুক্তি পাক।
হরিতকী কিংবা চিরতার ফুলের ভ্রমর হয়ে বাঁচতে চাই,
আর যাই হোক আমি মানুষ থাকতেই মরে যেতে চাই।
প্রজাপতির ঠোঁটে পরাগ হয়ে নয়তো জলের শ্যাঁওলা হয়ে থাকতে চাই বেঁচে।
মরে যেতে চাই এবারের মতো, মানুষ সত্ত্বা থাকতেই।
আমি সত্যি কারণ ছাড়াই মরে যেতে চাই।

শঙ্খ সাদার বুকের ভেতর থাকতে আমার আপত্তি নেই,
তবে, পুনর্জন্মে আর মানুষ হয়ে জন্মাবার আমার ইচ্ছে নেই।

তাই রংধনুর বিদায় বেলায় আমিও মরে যেতে চাই,
চাঁদের আকাশে, তারার দেশে আমিও অচিরেই জায়গা চাই।
আমি প্রত্নতত্ত্ব-ইতিহাস ভুলে,
নক্ষত্র কিংবা সমুদ্রের জলে মিশে যেতে চাই।
দীর্ঘশ্বাসের পেয়ালা ভেঙে এক্ষুণি আমি মরে যেতে চাই।

পৃথিবীর বিবেক অবশ হবার আগেই আমি এজন্মের মতো মুক্তি চাই।
আমি সত্যি, অমানুষ নয় মানুষ হয়েই মরে যেতে চাই
সভ্যতার কুলখানিতে অসভ্যতা চূড়ান্ত হবার আগেই

আমি মানুষ হয়েই মরতে চাই।
আমার বাংলা আমার থাকতেই আমি কোনো কারণ ছাড়াই চলে যেতে চাই।

শিক্ষার্থী: ঢাকা কলেজ

আলোর তাড়না

নাহিয়ান ফারুক

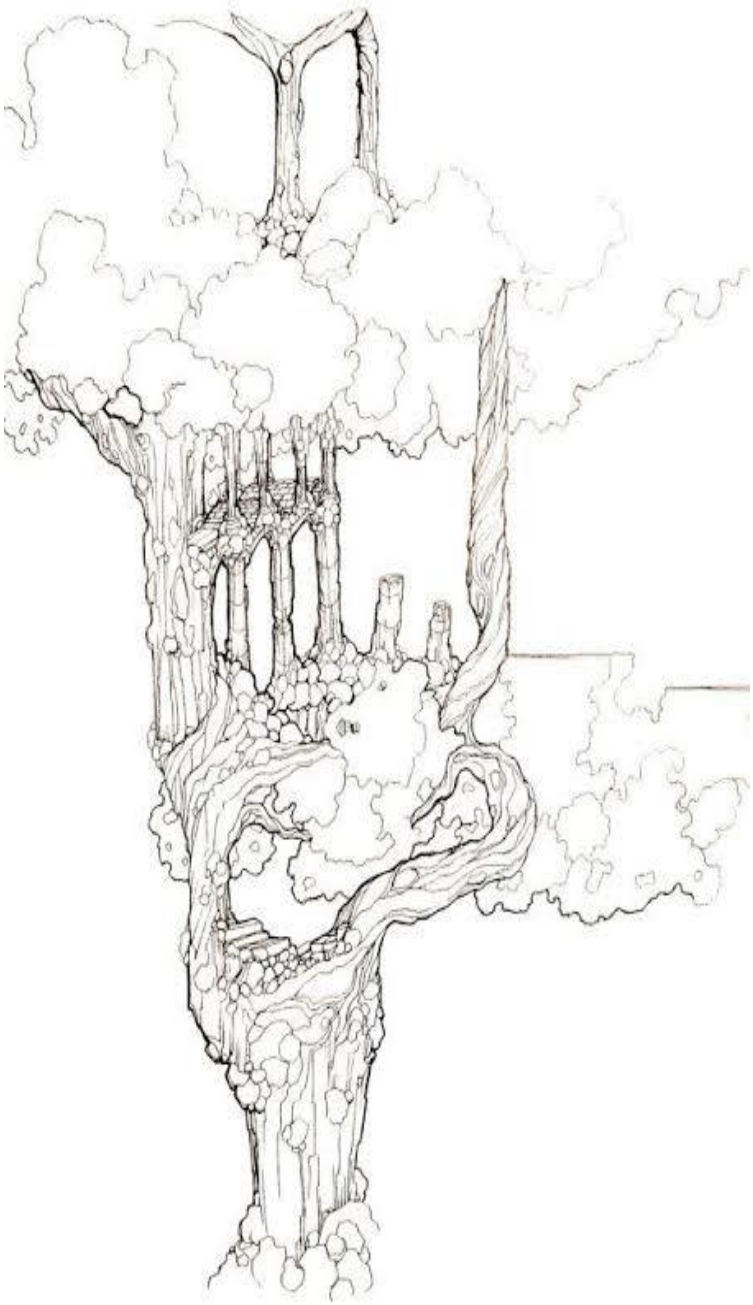

দুচোখ মেলে যতো দেখি সব সম্ভোগ তাড়নায়,
মরা মাছ খুলে রাখে সদা তার দুটি ঘোলা চোখ।
কে বেশি দ্যাখেছে জাগতিক নিয়ম অন্ধ ভিটায়?
চোখদুটো মেলে নিয়ে দেখেশুনে গুনে রাখা শোক।
জানি, সদুত্তরের চে' স্বল্প কিছু নেই;
চোখ বুজে থাকার চেয়ে বেশি কিছু নেই সুখের।
তবুও লোলুপ্ত দুই চোখ ধড়ফড় করেই,
সবদিক তার দৃষ্টির ফলা মেলে দেয়; ভোগের।
যতোবার গেঁথে যায় চোখে ক্যাকটাস
কচলানো ছাড়া কী আর থাকে করার! নিরুপায়।
সমস্ত দুর্যোগ রন্ধ্রে রন্ধ্রে গড়ে তুলে তার বাস,
ক্যানো জানি আগ্রহে তবু দুখ মাখামাখি গায়।
জানে যারা, অল্পে বুঝে রাখে দুই চোখ
অবুঝের চোখ শুঁষে যায়, সে আগ্রাসী এক শুঁড়।
যতো আলো সব বিপরীতে ততো আঁধারের রোগ;
তবু আলোর তাড়না তারে নাচায় পুরোদস্তুর।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লাল বেলুন ও নবীন কিশোর

সাদিক মাহবুব ইসলাম

আমায় একটা লাল বেলুন দাও,
আর দাও এক নবীন কিশোর,
আমি আমার শতছিন্ন দ্রোহের ইশতেহার
আকাশে উড়িয়ে দিই।

একদিন ভোরের আলোর মত
জানালার ফাঁক দিয়ে আমায় স্নাত করেছিল
বিপ্লবের প্রথম আলোচ্ছটা।
আমি যুদ্ধে গেছিলাম আমার মাংসের বর্ম
গায়ে জড়িয়ে, মাথায় ছিল হাড়ের শিরস্ত্রাণ।

আমি বিপ্লবকে ভালোবেসেছিলাম
কারণ সে ছিল প্রেমিকার মত উষ্ণ, জীবন্ত;
মিছিলের শ্লোগান ছিল তার কণ্ঠস্বরের মত
গভীর, সতেজ আর ছন্দিত বাঙময়।

এখন আমার করোটির মাঝে মগজ ভুনে খায়
সহস্র মৃত্যুদূত, আমি যজ্ঞের আগুনে ঘি ঢেলে
যে অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়েছিলাম, তাতে আত্মহত্যা করছি।
আমার লাশের ওপর চক্রাকারে ঘুরছে শকুন
আর তাকে ঘিরে সান্ত্রীদের বেয়নেটের ঝলকানি।

বিপ্লব ভালোবেসে আসেনা।
বিপ্লব প্রেয়সীর নধর গালের মত তুলতুলে
লাল গোলাপ নয়, তাই কোনো এক নামহীন ফায়ারিং স্কোয়াডে
আমি দাঁড়িয়ে আছি। যে রক্তগোলাপ পলে পলে
ছিনিয়ে নিয়েছে আমায়, সে গোলাপ আমার শার্টে এখন।

আমি আমার হাজার স্বপ্ন পুরে লাল বেলুনটা
তুলে দিতে চাই সেই নবীন কিশোরের হাতে,
সাথে তুলে দেব আমার না পাওয়া সবকটা
মিষ্টি চুমু। আকাশে আকাশে উড়বে আমার
অবিনশ্বর চির-বিদ্রোহী সত্ত্বা আর
কোনো এক গণকবর থেকে এই জন্মের তরে
যমদূতকে হারিয়ে দিয়ে আমি হাসব প্রাণভরে।

শিক্ষার্থী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবার শান্ত হও বিপ্লবী

মোহাঃ হাদিউল ইসলাম হাদি

বিপ্লবী, তোমার গায়ে হাত বুলায় তুমি শান্ত হও,
মিছিলের স্লোগান পকেটে পুরে একটা উপন্যাস হাতে নাও।
আমি চাই, তোমার শিরদাঁড়া একটু বিছানা স্পর্শ করুক
জ্বলে ওঠা চোখে প্রিয়তমার শেষ হাসিটুকু এসে প্রশান্তির ঘুম আসুক,
তুমি এবার ক্ষান্ত হও।
দাবি আদায়ের রাজপথ ছেড়ে,
প্রতিবাদী স্লোগান থামিয়ে,
অবকাশ যাপনের রেলিং ধরে একটু আনমনা হও।
তুমি আর যেওনা বিচার আদায়ে, মানবাধিকার আদায়ে
বাকশালের চোখে চোখ রেখে বাক অধিকার আদায়ে।
খবরের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে ফুটন্ত রক্ত হিম করো।
ময়দান ছেড়ে ঘরটাকে এবার আপন করো,
খুব একান্ত করে পাওয়া হয়নি তোমাকে কখনো।
নিজের মাঝেই নিজেকে নির্বাসিত করো।
আমি চাই, তোমার নির্বাসনে এবার ঘুমন্তরা জেগে উঠুক
যাদের কথা বলতে গিয়ে তামার সবকিছু বলিদান।
শয্যা ছেড়ে ঘিরে ধরুক গণভবন, আদালত প্রাঙ্গন
রাজপথে প্রকম্পিত হোক তাদের চিৎকার
তাদের হাতুড়ে তালা ঝুলুক ভোগবাদীদের গেইটে।
যাদের ন্যায় বিচারের দাবিতে ঘাম ঝরিয়েছো,
তাদের রক্তে রঞ্জিত হোক গণভবন, আদালতের পানি
চিৎকারে ভেঙে যাক দরজা-জানালা
ভারী নিঃশ্বাস বের হোক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র দিয়ে
চোখের আগুনে ঝলসে যাক গদি বিছানা
পদভারে পিষ্ট হোক গাড়ি, টাকাকড়ি।
তাদের স্বজনদের হারানো অশ্রুর স্রোতে ভেসে যাক সবি
তোমার গায়ে হাত বুলায়, তুমি শান্ত হও বিপ্লবী।

শিক্ষার্থীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সমাপ্ত